রামমোহন

বিচিত্র ব্যক্তিত্ব

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রামমোহন ফাউন্‌ডেশন বক্তৃতা ১৯৬০

অনন্য প্রকাশন · ৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল)

কলকাতা-৭৩

প্রকাশক : অনন্ত প্রকাশন, হীরক রায়, ৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩ মুদ্রাকর : সাধনা প্রেস, অজিত চৌধুরী, ৬৩এ
তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬ প্রচ্ছদ : বিদ্যা অশোক

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

রামমোহন রায় যে পরিবারে জন্মেছিলেন সে পরিবার তখনকার দিনের অন্যান্য অনেক বাঙালী পরিবারের মতো অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজসরকার, বিশেষ করে মুসলিম শাসকদের রাজস্ববিভাগে চাকরি নিতেন। আর সেই রোজগারের অর্থে সম্পত্তি কিনে স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করতেন। রামমোহনের প্রপিতামহ থেকে শুরু করে পিতা পর্যন্ত এই জমিদার শ্রে·র মানুষ। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করতেন বলে শোনা যায়। কিন্তু পরে তিনি নিজেরই গ্রামে বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। রামকান্ত রায়ের তিন স্ত্রী। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিণী দেবীই হলেন রামমোহনের মা। জীবনীকারের মতে, তারিণী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী ছিলেন এবং মার সঙ্গে রামমোহনের বিরোধ হলেও রামমোহন-চরিত্রের অনেক গুণ তাঁর মার কাছ থেকেই পাওয়া। কারণ তেজস্বিতা, প্রখর বুদ্ধি ও নিষ্ঠা—রামমোহন-চরিত্রের অন্য অনেক গুণের মধ্যে এই তিনটি গুণ তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে যা কিছু আভাস-ইঙ্গিত ও কিংবদন্তী আছে তা এই: তিনি কিছুদিন পাঠশালায় পড়েছিলেন। বাড়িতে ফার্সি শিখেছিলেন। তারপর তাঁর বাবা তাঁকে আরবি

শেখাবার জন্যে পাটনায় ও পরে সংস্কৃত শেখাবার জন্যে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই তথ্যগুলির কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম পরে একটি চিঠিতে (১৮২৬) জানিয়েছিলেন, রামমোহন কাশীতে দশ বছর সংস্কৃত পড়েছিলেন। তবে কাশীতে তিনি একটানা দশ বছর ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। রামমোহনের যে তিনটি বিবাহের কথা জীবনীকারেরা তথ্য প্রমাণ দিয়ে জানিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ সে বিবাহ-গুলি রামমোহনের ব্যক্তিত্ববিকাশের আগেই ঘটেছিল। যাই হোক, রাধানগরের বাড়িতে রামমোহনের জীবনের প্রথম চোদ্দ বছর যে কেটেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই চোদ্দ বছর বয়সেই আধ্যাত্মিক ও তান্ত্রিক পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই নন্দকুমারই পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। জীবনীকারের অনুমান, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা এঁরই শিক্ষার ফল। ইনিই রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে কিছুটা আকৃষ্ট করেন।

পনের বছর বয়সে রামমোহন অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রচর্চার উদ্দেশ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। তুহ্ফাৎ-উল মুয়াহ্হিদিন-এর ভূমিকায় দেখি, পার্বত্য ও সমতলভূমির নানান স্থানে তিনি ঘুরেছেন। কিন্তু রাম-মোহনের বন্ধু ও জীবনীকার ডঃ কার্পেণ্টার যে তিব্বত-ভ্রমণের কথা রামমোহনের মুখে শুনেছিলেন সেই তিব্বতের কথা রামমোহনের কোনো লেখার মধ্যেই নেই।

যাই হোক, রামমোহনের বয়স যখন সতেরো (জন্ম ১৭৭২ ধরলে উনিশ) তখন রামমোহনের বাবা সপরিবারে রাধানগরের পৈতৃক

বাড়ি ছেড়ে চলে যান মেদিনীপুর। সেখানে রামমোহনের দাদা জগমোহনের নামে একটি বড় তালুক কেনা হয়। এবং ১৭৯৬ সালে লেখা রামমোহনের একটি বাঙলা চিঠি থেকে জানা যায়, রামমোহন তখন বাবার বৈষয়িক সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন। কাজেই যে-বয়সে এখনকার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে স্কুল-কলেজের লেখাপড়া সবে শেষ করে চাকরির চিন্তা শুরু করেছে কি করেনি, সে বয়সে রামমোহনের অন্তত তিনটি ভাষা শিক্ষা হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে নানান মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, এবং বৈষয়িক দায়িত্ব পালন করবার রীতিমতো শিক্ষাও হয়েছে।

কিন্তু ওই বছরেই (১৭৯৬) রামকান্ত রায় তাঁর পুত্রদের সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। নিজে চলে গেলেন বর্ধমানে। এই সময় থেকে রামমোহন নিজের বিষয়সম্পত্তি সূত্রে কলকাতা, বর্ধমান এবং লাঙুল পাড়া অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক কোম্পানির সিভিলিয়ানকে তিনি সাড়ে সাত হাজার টাকা ধারও দিয়েছেন। এই সময় রামমোহন বর্ধমান অঞ্চলে দুটি বড় তালুক কিনেছেন এবং তার থেকে বছরে পাঁচ-ছ-হাজার টাকা আয় হতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রায় পরিবারের ভাগ্য-বিপর্যয় হলো। খাজনা বাকি থাকার ফলে বাবা ও বড় ভাইকে জেলে যেতে হলো। অবশ্য রামমোহন এই বিপর্যয় থেকে মুক্ত রইলেন। ১৭৯৯ সালে বন্ধু রাজীব লোচন রায়কে জমি-জমার বিলি-বন্দোবস্তের ভার দিয়ে রামমোহন পশ্চিমে যান। উদ্দেশ্য, খুব সম্ভবতঃ চাকরি বা অর্থ রোজগার। যে র‍্যাম্‌জে-কে তিনি সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়েছিলেন তিনি তখন কাশীতে।

রামমোহন কিন্তু বেশিদিন পশ্চিমে রইলেন না। কলকাতায় চলে এলেন। খুব সম্ভবত সময়টা ১৮০১ সাল। কারণ এই সময়েই তাঁর সঙ্গে সিভিলিয়ান ডিগ্‌বির আলাপ। ডিগবি লিখেছেন, সাতাশ-আটাশ বছরের তরুণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল।

পরে এই ডিগবিই (১৮১০, ১লা জানুয়ারী) রামমোহনকে তাঁর দেওয়ানের জন্য সুপারিশ করতে গিয়েই লেখেন, সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান কাজি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান ফার্সি মুন্‌শি এই দুজন রামমোহনের চরিত্র ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারবেন। রামমোহন নিজেও এর এক বছর আগে বড়লা-টের কাছে একটি দরখাস্তে লিখেছিলেন, তাঁর বংশ ও শিক্ষা সম্পর্কে সব খবর সদর দেওয়ানি আদালতে এবং. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কর্মচারী ও অন্যান্য কোম্পানির কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা যাবে। ডিগবির এই সুপারিশ এবং রামমোহনের দরখাস্ত থেকে মনে হয়, সদর দেওয়ানি আদালত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে রামমোহনের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের ফার্সি ও মুসলিম আইন শিক্ষার প্রয়োজনে সে যুগে কলকাতায় মৌলবীদের খুব কদর ছিল। কাজেই কৈশোরে আরবি ফার্সি পড়া ছাড়াও এই মৌলবীদের সাহায্য নিয়েই রামমোহন আরবি ফার্সির চর্চা রেখেছিলেন, এমনও হতে পারে।

কলকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম করতেন। কোম্পানির কাগজ লিখতেন ও তার ব্যবসা করতেন। ১৮০২ সালে টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানির এক সিভিলিয়ানকে রামমোহন

পাঁচ হাজার টাকা ধার দেন। এর কয়েকমাস পরেই তিনি ফরিদপুরে উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন যথারীতি জামিন দিয়ে (১৮০৩, ৭ই মার্চ)। কিন্তু দুমাস পরে (মে-মাসে) উডফোর্ড দেশে ফিরে গেলে রামমোহনও ফরিদপুর ছেড়ে চলে আসেন। এই সময়ে সাময়িক ভাবে রামমোহন আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়েন। বর্ধমানে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুশয্যায় (১৮০৩, ১৪ই মে) তিনি সম্ভবত ছিলেন না বলেই জীবনীকারের অনুমান।

বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে রামমোহন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। তবে ঠিক কী ব্যাপারে তা বোঝা যায় না। কিন্তু রামমোহন নিজের খরচেই কলকাতায় পৈতৃক শ্রাদ্ধ করেন। মা তারিণী দেবী লাঙুল পাড়ায় শ্রাদ্ধের কাজ করেন। ওদিকে রামমোহনের বড় ভাই জগমোহন মেদিনীপুরের জেলে থেকেই শ্রাদ্ধের কাজ করেন। বেশ বোঝা যায়, বাবার মৃত্যুর সময়ে পারিবারিক ভাঙনটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবনীতে দেখা যায়, মৃত্যুর সময়ে রামকান্ত কোনো নগদ টাকা রেখে যান নি। ঋণ ছিল বলে বর্ধমানের বাড়িটি বর্ধমানের মহারাজা দখল করে নেন। নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ যাট বিঘে জমির ব্রহ্মোত্তর অংশটুকু তারিণীদেবী দেবসেবায় দিয়ে দেন। কাজেই রামকান্তের মৃত্যুতে এবং বড় ভাই জগমোহনের কারাবাসে রায় পরিবারের অবস্থা তখন মোটেই ভালো নয়। কিন্তু কলকাতায় তখন রামমোহনের অবস্থা ভালোই। দু'চার মাস আগেও তা ছিল না। নিশ্চয় এই ক'মাসে কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি ব্যবসা সূত্রে রামমোহনের রোজগার ভালোই হয়েছে। কারণ ওই বছরেই

লাঙুল পাড়ার একটি বড় তালুক কিনেছেন। বলতে দ্বিধা নেই, প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন রামমোহন তখন দুই সিভিলিয়ানের সংস্পর্শে এসেছেন। উডফোর্ডের দেওয়ানগিরি তো আগেই করেছেন, এখন তাঁর সঙ্গে পেয়েছেন র‍্যামজে-কে। এই দুই সিভিলিয়ানই তখন মুর্শিদাবাদে। উডফোর্ড তখন কোম্পানির চাকরি করেন না, সম্ভবত তাঁর মুনশিগিরি করতেই রামমোহন মুর্শিদাবাদ চলে যান।

কিন্তু জমি-জমা দেখা, কোম্পানির কাগজের ব্যবসা এবং দেওয়ান বা মুনশিগিরির সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের সংস্কৃত-আরবি-ফার্সি চর্চার আকর্ষণ চলেছে অব্যাহত। একদিকে যেমন সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে জমি-জমা সম্পত্তি প্রসারে নজর রাখছেন, দেওয়ানগিরি করে আয়ের পথটি সুগম করার চেষ্টা করছেন, তেমনি পড়াশোনার চর্চ্চা করে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন, বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্রটিকেও বাড়িয়ে নিচ্ছেন। তাই দেখি, মুর্শিদাবাদে থাকতেই রামমোহন একেশ্বরবাদ-সম্পর্কিত ফার্সি বই (ভূমিকাটি আরবিতে) তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদিন লিখেছেন। বিষয়কর্ম ও বিদ্যাচর্চা—দুদিকেই তিনি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু মুর্শিদাবাদে রামমোহনের বসবাস বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। একবছরের মধ্যেই উডফোর্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮০৫-এর আগষ্ট মাসে দেশে ফিরে যান। কিন্তু উডফোর্ডের ইংল্যাণ্ড ফিরে যাওয়াতে রামমোহনের কি পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয়েছিল? হয়নি। কারণ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন, সংস্কৃত-আরবি-ফার্সি জানা এবং একটু আধটু ইংরিজি জানা রামমোহন তখন কাজের লোক বলে সহজেই কোম্পানির সিভিলিয়ানদের নজরে পড়ে যেতেন। কাজেই

উডফোর্ড চলে গেলেও রামমোহন নজরে পড়ে গেলেন সিভিলিয়ান ডিগবি-র।

॥ ২ ॥

আঠারো'শ পাঁচের মাঝামাঝি থেকে আঠারো'শ চোদ্দ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে ডিগ্‌বির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সময়। এই ন'বছরে রামমোহন ডিগ্‌বির সঙ্গে প্রথমে রামগড়, রামগড় থেকে যশোহর, যশোহর থেকে ভাগলপুর এবং শেষে ভাগলপুর থেকে রংপুর যান। কিন্তু ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক ঠিক মনিব-কর্মচারীর সম্পর্ক ছিল না। বিচক্ষণ রামমোহন ডিগবির কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়েন। এবং সেই সুযোগে তিনি ডিগবির কাছে খুব চোস্‌ত্‌ ইংরিজিও শিখে ফেলেন। রামমোহনের আবেদনপত্র পড়লেই বোঝা যায়, তৎকালীন দীর্ঘবাক্যের ভারিক্কে ইংরিজি চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। যাই হোক, কর্মচারী যদি কাজের লোক হয়, বিদেশী মনিবের সুবিধে হয়। কর্মচারী যদি দেশীয় একাধিক ভাষায় বলতে কইতে পারে, তাহলে বিদেশী মনিবের আরও সুবিধে হয়। আর তার ওপর কর্মচারী যদি মনিবের ভাষাটুকু গভীর আগ্রহের সঙ্গে শিখতে চায় তাহলে সমবয়স্ক শিক্ষক ও ছাত্র বন্ধু হয়ে যায়। ডিগবি-রামমোহনের সম্পর্ক এই রকমই ছিল।

সিভিলিয়ানদের মুগ্ধ করতে পটু রামমোহন কিন্তু ঠিক 'সাহেব-ভক্ত' ছিলেন না। বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবহারে সাধারণভাবে তিনি

আত্মসম্মান বজায় রেখেই চলতেন। ডিগবি ভাগলপুরে বদলি হলে রামমোহনও ভাগলপুরে যান। যেদিন তিনি ভাগলপুরে পৌঁছোন (জানুয়ারী ১৮৯০) সেদিনই তাঁর সঙ্গে ভাগলপুরের কালেকটর স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের সংঘর্ষ হয়। মুসলিম আমলে উঁচু পদে রাজকর্মচারীদের সামনে দিয়ে সাধারণ লোকের পাল্‌কিতে, ঘোড়ায় চড়ে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ইংরেজরা এদেশে এলে তাঁদের কেউ কেউ এই সম্মান আদায় করতে ভালোই বাসতেন। হ্যামিলটন ছিলেন এই জাতীয় ইংরেজ। রামমোহন যখন পাল্‌কি করে যাচ্ছিলেন হ্যামিলটন তখন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সম্মানে লাগলো। তিনি পাল্‌কির আরোহীকে নামতে বললেন। পাল্‌কি থামলো না দেখে হ্যামিলটন ঘোড়া ছুটিয়ে পালকি থেকে রামমোহনকে নামালেন। রামমোহন ভদ্রভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। হ্যামিলটনকে তবুও ক্রুদ্ধ দেখে রামমোহন আবার পালকিতে চেপে চলে গেলেন। এবং এই অপমানের প্রতিকার চেয়ে লর্ড মিণ্টোর কাছে আবেদন করলেন। আবেদনের ফলে হ্যামিলটনের ওপর আদেশ হলো, তিনি যেন নেটিভদের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার না করেন। রামমোহন আবেদনে লিখেছিলেন, নেটিভরা সাধারণভাবে অনেকেই ইংরেজ মহলে অত্যন্ত সমাদর পান। নেটিভ বলে ঘরের মধ্যে বসে থাকা সম্ভব নয়। রাস্তায় এ ধরনের অপমান করা অন্যায় এবং মনে রাখা উচিত, বিদেশী শাসকের মতো নেটিভদেরও বংশ-মর্যাদা আছে। এই সুযোগে রামমোহন নিজের পিতামহ ও পিতার প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করতে ছাড়েন নি। নিজের শিক্ষা ও বংশগত আভিজাত্যের সূত্রে

রামমোহন যে সদর দেওয়ানি আদালতের আমলাদের সঙ্গে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কোম্পানির অন্যান্য সিভিলিয়ানদের সঙ্গে পরিচিত সে কথা জানাতেও ছাড়েন নি। কাজেই প্রয়োজনবোধে সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হলেও দেশীয় আভিজাত্যে ঘা লাগলে রামমোহন প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি। ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর ওপর কোনো কোনো ইংরেজদের নির্ভরতাই রামমোহনকে এই প্রতিবাদের সংসাহস জুগিয়েছিল। ডিগবি রামগড়ে অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট হলে রামমোহনকে তাঁর সেরেস্তাদার করেন। ডিগবি রংপুরে কালেক্টার হয়ে চলে গেলে রামমোহনকে সেখানে নিয়ে যান এবং অস্থায়ী দেওয়ান করেন। এবং রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করবার জন্যে ডিগবি অনেক চেষ্টাও করেন। শেষ পর্যন্ত বোর্ড অফ রেভিনিউ-র কাছে ধমক খেয়ে থেমে যান। অন্য একজন স্থায়ী দেওয়ান নিযুক্ত হন। বোঝা যায়, রামমোহন ডিগবিকে তাঁর বিচক্ষণতা ও বিদ্যাবত্তায় খুবই মুগ্ধ করেছিলেন। রামমোহনকে দেওয়ান করার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আপত্তি হিসেবে কতকগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকার সময় তাঁর কাজ সম্পর্কে নিন্দার যোগ্য রিপোর্ট ছিল বলে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করেছিলেন। এই অপ্রশংসার জন্যে কতখানি রামমোহন দায়ী তা স্পষ্ট নয়।

যাইহোক, ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদার ও দেওয়ান হিসেবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করেছেন রামমোহন। অন্য সময়ে ডিগবির সঙ্গে তাঁর খাস ফার্সি-মুনশির কাজ করেছেন (যেমন যশোহরে)। দেশীয় লোকের সঙ্গে যোগাযোগে ডিগবির কাছে

রামমোহন ছিলেন অপরিহার্য। কাজেই বিদেশী ওপরওয়ালার পক্ষে নির্ভরশীল মানুষ হিসেবে রামমোহনের যোগ্যতাকে মানতেই হবে।

কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, বিত্তাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা রামমোহনের অর্থোপার্জনের বিচক্ষণতাকে নষ্ট করে নি। রংপুরে অস্থায়ী দেওয়ান থাকার সময়ে রামমোহন চাকরি ও ব্যাবসা করে যথেষ্ট টাকা রোজগার করেন। রংপুর এবং কলকাতা দু'জায়গাতেই তাঁর হিসাবরক্ষক ও তহশিলদার ছিল। রংপুর থেকে রামমোহন যে টাকা পাঠাতেন তা কলকাতায় তাঁর নিজস্ব তহশিলদার রামমোহনের নামেই জমা রাখতেন। রংপুর ছেড়ে কলকাতায় এলে রামমোহন বেনিয়ানের কাজ শুরু করেন। সুদে টাকা খাটানো এবং টাকা শোধ করতে না পারলে সম্পত্তি ক্রোক করে বিক্রি করে দেওয়াই ছিল এই ব্যবসার মূল কর্তব্য। ফলে এই ন'বছরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন। দশ বছর চাকরি করে বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি কিনেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র এই আর্থিক উন্নতির মূলে ঘুষের ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস-কার লিওনার্ড এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছেন, রামমোহন যা নিতেন তা ঘুষ নয়, দেওয়ানের আইন-সঙ্গত 'Perquisites'। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রামমোহন এই ন'বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কোম্পানির চাকরি করেছেন মাত্র এক বছর ন'মাস। সরকারী চাকরিতে তিনি যাই সঞ্চয় করুন তাঁর আয়ের অন্য পথ ছিল। বহুদিন তিনি ডিগবির খাস মুনশি ছিলেন, কলকাতায় কোম্পানির শেয়ারের ব্যাবসা করেছিলেন এবং

সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিতেন। বড় তেজারতির কারবার বা ব্রোকারির যা কাজ সেই কাজেই রামমোহনের সম্পত্তি বেড়েছিল।

কিন্তু এই বৈষয়িক উন্নতিতে তৎপর রামমোহনের আত্মীয়-স্বজন আর্থিক দুরবস্থায় ভুগছিলেন। বড় ভাই জগমোহন তো জেলেই ছিলেন, রামমোহনের মা তাঁকে দশ টাকা মাসিক সাহায্য দিতেন। জগমোহন গভর্নমেণ্টকে কিছু টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পাবার আশায় অর্থশালী কনিষ্ঠ ভাই রামমোহনকে অনেক অনুরোধ করেন। এবং সুদ সমেত টাকা ফিরিয়ে দেবেন এই বণ্ড লিখে দেবার পর (১৮০৫, ১৩ই জানুয়ারী) রামমোহন বড় ভাইকে এক হাজার টাকা ধার দেন। জগমোহন এই টাকা দিয়ে এবং বাকী প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা মাসিক কিস্তিতে ফেরত দেবেন এই অঙ্গীকার পত্র দিয়ে মেদিনীপুর জেল থেকে মুক্তি পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগমোহন রামমোহনের টাকা শোধ করার আগেই মারা যান। এর দু'বছর আগে রামকান্তের তৃতীয়া পত্নীর পুত্র রামলোচন মারা যায়। তখন জগমোহনের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ ছাড়া রামমোহনের আত্মীয়দের আর কেউ জীবিত রইলেন না। অবশ্য মা বেঁচে ছিলেন। রামমোহন দাদার কাছ থেকে টাকা ফেরত পাননি এটা যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমনি জগমোহনের বিপদে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর যে রামমোহন সুদ-সমেত টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন এটাও তেমনি দুঃখজনক বলেই মনে হয়। নিশ্চয় পারিবারিক কোনো মন কষাকষির ব্যাপার ছিল।

৩ ॥

১৮১৪ সালের ২০শে জুলাই ডিগবি রংপুর ছেড়ে এলেন। সেই সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। এই সময় থেকেই রামমোহনকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখি। কলকাতায় বসবাস করার সময় থেকেই রামমোহনকে বেশ সম্পন্ন দেখতে পাই। ওই বছরই তিনি দুটি বাড়ি কিনেছেন। একটি চৌরঙ্গীতে—ফেনউইক নামে এক মেমসাহেবের কাছ থেকে কেনা। আর একটি মানিকতলায়—মেন্‌ডেস নামে এক সাহেবের কাছ থেকে কেনা। লাঙুলপাড়ার বাড়ির নিজের অংশ রামমোহন ভাগ্‌নে-কে দান করেন। এবং মা-র সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় লাঙ্গুলপাড়া ছেড়ে কাছাকাছি রঘুনাথপুরে আলাদা একটি বাড়ি তৈরি করেন।

কলকাতায় অর্থশালী বলে রামমোহনের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয় অল্পদিনের মধ্যেই। মানিকতলার বাড়িতে দেশী-বিদেশী অনেক মান্য-গন্য ব্যক্তি আসতেন। বিদেশীরা ভারত ভ্রমণে এলে কলকাতায় রামমোহনের সঙ্গে দেখা করতেন। ভ্রমণকারীর মধ্যে আর্ল অব ম্যানস্টার, ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্‌তর জাকুঁম এবং ইংরেজ মহিলা ফ্যানি পার্কসের নাম করা যেতে পারে। ফ্যানি পার্কস তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়িতে একটি পার্টির আয়োজনে প্রচুর রোশনাই, বাজীপোড়ানো এবং তখনকার সবচেয়ে দামী বাইজি নিকীর নাচ দেখেছিলেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে দেখা যায়, সেকালের সব বড়লোকের মতোই রামমোহন মুসলিম সংস্কৃতির ভক্ত। মুসলমানী জোব্বা চাপকান পরতেন। অনেকের ধারণা, তিনি

মুসলমানদের সঙ্গে পানভোজনও করতেন। গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে যবন বলে মনে করতেন। কিন্তু রামমোহন আচার-ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন ঘটান নি।

রামমোহনের এই যবনী আভিজাত্যের জন্যেই তাঁর ভাইপো তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন বলে শোনা যায়। মামলার কারণ আসলে অন্য। ভাইপো গোবিন্দ-প্রসাদের অভিযোগ ছিল, রামমোহন একান্ন-বর্তী পরিবারের অনেক সম্পত্তি ভোগ করছেন। কাজেই সে সম্পত্তি-তে ভাইপোর অধিকার আছে। রামমোহন এই দাবি অগ্রাহ্য করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে তিনি এই সম্পত্তি কিনেছিলেন। পরে গেবিন্দপ্রসাদ মামলা তুলে নেন। অন্য লোকে তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে বলে ক্ষমা প্রার্থনাও করেন।

যাই হোক, সিভিলিয়ান সংস্পর্শে থেকে ইংরিজি ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেও আরবি-ফারসি জানা মুসলমান-শাস্ত্রজ্ঞ রাম-মোহন হিন্দু সংস্কৃতির চেয়ে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি কম আকৃষ্ট ছিলেন না। এই মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি ভক্তি কলকাতায় এসেই তাঁর বেশী বেড়েছে। নইলে যৌবনে তো রামমোহন দেশাচারের বিরোধিতা করেননি। পারিবারিক বিগ্রহ সেবার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার করেই বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়েছিলেন। পৈতৃক শ্রাদ্ধও করেছিলেন কলকাতায় আলাদাভাবে। ধর্ম, শিক্ষা ও রাজ-নীতিসংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের কথা আলাদা করে বলা যাবে। এখানে শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, রামমোহনের সঙ্গে তার মা-র কলহের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাবার শ্রাদ্ধের

সময়। এই কলহের জন্যেই রামমোহন আলাদাভাবে পৈতৃক শ্রাদ্ধ করেন কলকাতায়। এই কলহে রামমোহন ধর্মীয় আচার-সংস্কারের পরির্বতন একমাত্র কারণ নাও হতে পারে। কিছুদিন আগে থেকে বাবা এবং বড় ভাই দুরবস্থায় পড়ে দেওয়ানী জেলে বন্দী ছিলেন। এবং আর্থিক সংগতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন বাবা ও ভাইকে সাহায্য করেন নি বলেও রামমোহনের ওপর মা তারিণী দেবীর যথেষ্ট অভিমান থাকতে পারে।

এই ঘটনার পর প্রায় এগারো বছর রামমোহন আত্মীয়স্বজন ও গৃহ থেকে দূরে। এর মধ্যে পাঁচ বছর রংপুরে কেটেছে। রংপুরে যেমন ইংরেজি শিখেছেন তেমনি হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামীর সংস্পর্শে হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রও পড়েছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র পড়লেও প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস অনেকদিন আগেই তাঁর চলে গিয়েছিল, তুহাফৎ লেখাতেই তার প্রমাণ। এবং ১৮২০ সালে প্রকাশিত An Appeal to the Christian Public বই-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, প্রতিমা-পূজার প্রতি তাঁর অবিশ্বাস এমনই এক, 'renunciation 'that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents and subjecting him to the dislike of his near, as well as distant relations and to the hatred of nearly all his countrymen for several years'.

'সত্যের বন্ধু' বা A Friend of Truth-এর ছদ্মবেশে একথাগুলি রামমোহনেরই নিজের কথা। এই বইটির চার বছর আগে প্রকাশিত Translation of an Abridgment of the Vedant বইটির

ভূমিকাতেও সরাসরি বলেছিলেন 'I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system. আসলে এই 'বেদান্ত'গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকেই (১৮১৬) আত্মীয় স্বজন এবং বিশেষ করে মা-র সঙ্গে তাঁর মনান্তরের প্রমাণ বেশী করে পাওয়া যায়। ভাইপো গোবিন্দ-প্রসাদের সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় তাতে রামমোহনের মা-কে জেরা করবার জন্যে যে প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয় তার অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিল, 'আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই ?' পরিষ্কার বোঝাই যায়, প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে মা-র বিরোধ হয়। ঠিক এই সময়েই রামমোহন ভাগনে-কে পৈতৃক বাড়ির অর্ধাংশ বিক্রয় করে পারিবারিক বিগ্রহ সেবার ব্যয়ভার থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

মুসলমানি এবং মিশনারি বিদ্যাচর্চার প্রভাবে তখন কলকাতায় যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী আবহাওয়া এসেছিল রামমোহন সেই আবহাওয়ারই ছোঁয়া পেয়েছিলেন। প্রথমে মুসলমানি বিদ্যা এবং পরে ইংরিজি শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় রামমোহনকে প্রচলিত ধর্মমতে সংশয়ী ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী করে তোলে। এই পরিবর্তনের সূচনা হয় প্রাপ্ত বয়স্ক রামমোহন যখন উডফোর্ড ও র‍্যামজের সঙ্গী হয়ে মুর্শিদাবাদে যান। সেখানেই তুহফাৎ লেখা হয়।

॥ ৪ ॥

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, শিক্ষাচিন্তা ও রাজনীতি চিন্তার কথা পরে তুলবো। কিন্তু নিছক ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে এগুলিও জড়িত। কলকাতাবাসী রামমোহনের ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতি-গত চিন্তা সব কিছু মিলিয়েই সমগ্র রামমোহনের বিতর্কিত বহুবর্ণময় ব্যক্তিত্ব। সংস্কারককে চিরকাল বাধা-বিপত্তি ও নিন্দার সম্মুখীন হতেই হয়। তাই দেখি, আত্মীয়-স্বজনের বিরোধ কেটে গেলে শুরু হলো পাদরিদের সঙ্গে ঝগড়া, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে আবেদন, হিন্দু শাস্ত্রের পণ্ডিতদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক; কিন্তু সব বিবাদেই বৈষয়িক বুদ্ধিতে বিচক্ষণ রামমোহন বিতর্ক ও মত প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত ধীর-স্থির, অনুসন্ধানী ও যুক্তিনির্ভর। কোনো উগ্র মন্তব্য তাঁর নেই, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অসংযত উচ্ছ্বাসী আক্রমণও প্রায় নেই। যে মানুষ আকৈশোর বিদ্যাচর্চা করেছেন, বিষয়কর্ম করেছেন, ইংরেজ সিভিলিয়ানের সংস্পর্শে বিদ্যায় ও কাজে সমান বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন এবং ভালো মন্দ যাই হোক, বিষয় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনে অটুট থেকে আত্মীয় স্বজনের বিরোধে ও মামলা-মোকদ্দমায় নিন্দা কুৎসা নির্বিকার ভাবে গায়ে মেখেছেন তাঁর পক্ষে প্রৌঢ় বয়সে নতুন ক'রে শাস্ত্রকেন্দ্রিক জ্ঞান-বুদ্ধিগত বিবাদ বিতর্কে উত্তেজিত হবার কারণ নেই। তাই ধর্মসংস্কারে নেমেছেন, সাময়িক পত্র চালিয়েছেন, নতুন ধর্মের সমাজ স্থাপন করেছেন, দলাদলিতে নিঃসঙ্গ হয়েছেন, আবার নতুন করে সমাজ গড়েছেন, হিন্দু মুসলমান এবং পাদরি নিয়ে ধর্মসভা তৈরি করেছেন—অ্যাডাম

সাহেবকে দলে টেনেছেন, গোলাম আব্বাসকে দিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে পাখোয়াজ বাজিয়েছেন। সব মিলিয়ে তিনি এক প্রবাদপুরুষ। অষ্ট্রিয়া যখন নেপল্সের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে তখন স্বাধীনতার শত্রুদের অভিশাপ দিয়েছেন রামমোহন। দক্ষিণ অ্যামেরিকার উপনিবেশগুলি স্পেনের গ্রাস থেকে মুক্তি পেলে তিনি ভোজ দিয়েছেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উদারনৈতিক প্রবণতায় আনন্দ করেছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজার কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন, উত্তরাধিকার আইন ও জুরীপ্রথার প্রবণতা সম্পর্কেও আন্দোলন করেছেন। আবার এই রামমোহনেরই দেওয়ানি অভিজ্ঞতা, ভাষা-জ্ঞান, উদারনৈতিক নির্ভীক মানবিকতা দিল্লীশ্বরকে আকৃষ্ট করেছে। মুঘল সম্রাটের রাজস্ব-অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনা করবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের দূত নিযুক্ত হয়েছেন। 'রাজা' উপাধিধারী রামমোহনের দৌত্য কোম্পানি স্বীকার না করলে সাধারণ মানুষ (Common man) হিসেবেই রামমোহন অনুমতি চেয়েছেন, এবং অনুমতি পাওয়ার পরই ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে দিল্লীশ্বরের দূত হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে রামমোহনের সাংসারিক ও বৈষয়িক বিচক্ষণতা খুবই কাজে লেগেছিল। একাধারে ধুরন্ধর এবং উদার-নৈতিক, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ-তার্কিক, সংগঠক-সংস্কারক এবং সচ্ছল, বিলাসী ও উৎসবমত্ত, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং প্রাগ্ম্যাটিস্ট রামমোহন বড় বিস্ময়কর চরিত্র। একাধারে বন্ধুবৎসল ও বৈষয়িক রামমোহন ব্রিস্টলে মৃত্যুর আগে দেশীয় ব্যবসায়িক হাউস ফেল হয়ে যাওয়ায় আর্থিক কষ্টে প'ড়ে হেয়ার ও কার্পেন্টার পরিবারে

আতিথ্য ও যত্ন পেয়েছিলেন। পুত্রদের বিষয় সম্পত্তি পেতে অসুবিধা হতে পারে ভেবে বন্ধুদের তিনি অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, তাঁকে যেন খ্রীস্টান সমাধিতে সমাহিত না করা হয়। একধারে চিন্তাশীল ও বৈষয়িক রামমোহন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়ে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান ধর্মের-সারবস্তুকে আত্মসাৎ করে একেশ্বরবাদী হলেও ব্রাহ্মণের দেহসংশ্লিষ্ট যজ্ঞোপবীতটি রেখে দিয়েছিলেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হয়েও যিনি মূর্তি উপাসনাকে মানেন নি, পারিবারিক বিগ্রহসেবার ভার ছেড়ে যিনি বিষয় সম্পদে বলিষ্ঠ হয়ে ধর্মসংস্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ধর্মালোচনা করতে করতেই যিনি বিলিতি পার্টির রোশনাইতে জুড়ে দিয়েছিলেন নিকী বাইজির নূপুর-নিক্বণ, জমি-জমার মালিক হলেও যিনি চাষীদের দুঃখের কথা পার্লামেণ্টের সিলেক্‌ট কমিটির কাছে অকপটে বলেছিলেন, বেনিয়ানি আর তেজারতি ক'রে বিষয় সম্পত্তি বাড়িয়েও গানের তরী ভাসিয়ে যিনি বলতে পেরেছিলেন 'মনেতে বৈরাগ্য আনো, হৃদে সত্য পরাৎপর', মনের ঘরে বৈরাগ্যের বিষণ্ণ হাওয়া বইয়ে দিয়েও যিনি যুক্তি-বুদ্ধির ঘরে গিয়ে বলেছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়, মুঘল সম্রাটের খেতাব নিয়ে এবং বাদশাবৃত্তি পেয়েও যিনি বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের কল্পনায় মজেছিলেন এবং মানুষের সব রকম স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, সেই রামমোহন শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি পর্যন্ত যজ্ঞোপবীত ছাড়েন নি।

আজকে যদি তাঁর জন্মের দুশো বছর পার হবার পরে কেউ তাঁর চরিত্রের এই স্ববিরোধিতাগুলির প্রতি কেবলই দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করে তাহলে তাঁর ভরাট বিশাল কণ্ঠস্বর অদৃশ্য থেকে মুখের ওপর জবাব দিয়ে বলতে পারে: 'Do I contradict myself ?

Very well then I contradict myself ; I am large, I contain multitudes'.

সব রকম সমকালীন অসংগতিকে আত্মসাৎ করে আমাদের কালকে স্পর্শ করেছেন রামমোহন তাঁর বিশ্বমানবিক বিশাল প্রাণ নিয়ে।

রামমোহনের ধর্মমতের যে পরিবর্তন তুহ্ফাৎ উল মুয়াহ্‌হিদিন লেখার সময়ে ঘটেছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে তাঁর মা তারিণী দেবীর সঙ্গে মনোমালিন্য ও মামলা মোকদ্দমার সূত্রে। এসব কথাই রামমোহনের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রে সংক্ষেপে বলেছি। রামমোহন তাঁর ধর্মমত গঠনে কতটুকু হিন্দুশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন, কতটুকু ইসলাম থেকে, আর কতটুকুইবা খ্রীস্টান ধর্ম থেকে, তার সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে যাচ্ছি না। তবে ধর্মমত পরিবর্তনের সাধারণ রূপরেখাটুকু দিয়ে সেই মত ও বিশ্বাস রক্ষায় তাঁর ধীর স্থির যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সে-কথাই প্রথমে বলবো—যে ব্যক্তিত্ব ধর্মীয় আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে এসেছিল।

কৈশোরে ও যৌবনে রামমোহন যে পারিবারিক পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন তাতে তিনি বৈষয়িক বুদ্ধিতে প্রবীণ হয়েছিলেন বাবার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে, বাবার সম্পত্তি পেয়ে, ব্যবসা করে, সিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিয়ে, নিলামে সম্পত্তি কিনে এবং তেজারতি কারবার করে। এ-সব কিছুর সঙ্গে জীবিকার জন্যে আরবি-ফারসি শিখেছেন, সংস্কৃত শিখেছেন, পরে সংস্কৃত পণ্ডিত হরিহরানন্দের সংস্পর্শে এসে শাস্ত্র পড়েছেন, সিভিলিয়ানদের কাছে ইংরিজি শিখেছেন। কৈশোরে ও যৌবনে রামমোহন যুক্তিবাদী মন নিয়ে

যেভাবেই শাস্ত্রবিচার করুন তিনি কখনো প্রচলিত ধর্ম বা দেশাচারের বিরুদ্ধে যান নি। তার প্রমাণ, প্রথমত, পারিবারিক বিগ্রহ সেবার ভার নিয়েছিলেন বাবার সম্পত্তি নিয়ে (১৭৯৬)। দ্বিতীয়ত, বাবার মৃত্যুর পর আলাদাভাবে কলকাতায় পৈতৃক শ্রাদ্ধ করেছিলেন।

তবে রামমোহনের লেখা বই থেকে জানা যায়, দেশাচারের বিরুদ্ধে না গেলেও পৌত্তলিকতার ওপর আস্থা তিনি অনেকদিনই হারিয়েছিলেন। এবং পৌত্তলিকতার প্রতি আস্থা হারিয়েই তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় 'তুহ্ফাৎ' লেখেন। ১৮২০ সালে প্রকাশিত An Appeal to the Christian Public নামে পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি ছদ্মনামে লেখা আত্মপরিচয়ে লিখেছিলেন—

'Rammohun Roy....although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian aginst that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship-known to the Christian world by his English publication....

বোঝা যায়, ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই তিনি পৌত্তলিকতা ছেড়েছিলেন পরে, ইংরিজি শেখার পর, তাঁর পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্মচিন্তাকে ইংরিজি পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। কিন্তু এই ধর্ম ও দেশাচার পালন নিয়েই মা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সময় থেকেই হরিহরানন্দ তীর্থ-স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি দেশীয় শাস্ত্র পুনর্বিচার [illegible]

বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি প্রকাশ করে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজস্ব পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাবের প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকে তিনি আবেগ উচ্ছ্বাসের বশে উড়িয়ে দেন নি। বরং হিন্দু ধর্মের ভেতরে থেকেই তার যুগোপযোগী সংস্কার করে সংস্কারের মনোভাব সমকালীন মনে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন। প্রচলিত প্রথাকে তিনি গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে নস্যাৎ করতে চান নি। সব সময়েই তর্কবির্তকে এগিয়ে গেছেন। বিপক্ষ মতামতের রাস্তা খুলে রেখেছেন, অন্যের মতামত পেয়ে নিজের যুক্তি-ধারণা মতো ধীর স্থিরভাবে এগিয়ে গেছেন, রাধাকান্ত দেবের মতো অন্ধভাবে প্রচলিত প্রথাকে আঁকড়ে রাখেন নি। কাজেই তাঁর কৌশল ছিল ব্যক্তিগত বা সামাজিক আলোচনায় নিজের মতামতকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা, যে কোন সমস্যার আলোচনাকেই পুস্তিকাকারে বা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশ করে নানা দিক থেকে নিজের সিদ্ধান্তটিকে আলোকিত করা। এবং, বিদ্যালয় বা সাধারণ শিক্ষার মান উন্নত করে শিক্ষিত মানুষের সামনে শাস্ত্র বিচারে নতুন দৃষ্টিকে তুলে ধরা। শেষ পর্যন্ত রামমোহন এই পদ্ধতিতেই প্রথমে 'আত্মীয় সভা' পরে 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' (১৮২১) এবং শেষে 'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ইসলামী মতে আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদী হন এবং সেই মতো হিন্দু শাস্ত্রের ভাষ্য তৈরী করেন। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুদের প্রাচীন ও সম্মানিত শাস্ত্র বিচার করে প্রমাণ করবেন, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত। ক্রমে রক্ষণশীলদের আক্রমণে রামমোহন কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের অলৌকিকতা ও অবতারবাদ বাদ দিয়ে ইউনিট্যারিয়ান

খ্রীস্টান মতেই ধর্মোপাসনা শুরু করেন। এই সূত্রেই তিনি অ্যাডাম সাহেবকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন।

কিন্তু এই পদ্ধতি রামমোহনের মনে ঠিক ধরেনি যার জন্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেবের মতো রামমোহনের বন্ধুরা বিদেশী উপাসনা মন্দিরের বদলে দেশীয় মন্দির বেশী অভিপ্রেত বলে মনে করলে রামমোহন রাজি হয়ে গেলেন এবং ব্রহ্মোপাসনার জন্যে একটি নতুন সভা প্রতিষ্ঠা করলেন যা 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে প্ররিচিত। কিন্তু ইউনিট্যারিয়ানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। কারণ খ্রীস্টানদের উপাসনা-পদ্ধতি—বাইবেল পাঠ, গাথা গান ও প্রচারের পদ্ধতিতেই রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজে বেদপাঠ, উপনিষদ ব্যাখ্যা ও সঙ্গীতের প্রচলন করেন। যে নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাসনা রামমোহন প্রচলন করেন তা বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যে নয়, সব মানুষের সব ধর্মের একেশ্বরের জন্য। তবু কার্যত এই সমাজ হিন্দু ঈশ্বর-বিশ্বাসীদেরই মিলিত উপাসনাস্থল হয়ে দাঁড়ালে এবং রামমোহন ইংল্যাণ্ড চলে গেলে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই হয়ে পড়লো। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত সমাজ পরবর্তী চেহারা যাই নিক, রামমোহন পৃথিবীর সমস্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মের মূল যে অনন্ত সত্তা বা পরম ব্রহ্ম তাকেই নিষ্কাশিত করে নিয়ে ছিলেন। সংস্কারক হিসেবে রামমোহনের কৃতিত্ব এই যে, সব ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। প্রত্যেক সম্প্রদায় একই ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে বিরাট ভারসাম্যহীন স্বকীয় আনুষ্ঠানিকতার বেড়া তৈরী করে রেখেছে তার বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিশ্বধার্মিক দৃষ্টি রামমোহনের ব্যক্তি-চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ এবং এই দৃষ্টি-পথে

সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি দুটি দিকের প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। প্রথমত, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ, ভারতে শাসকশ্রেণী ও বিদেশীদের এই কথাই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারিত বীভৎস হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী মনোভাবের কোনো ভিত্তি নেই। হিন্দুশাস্ত্র মূলত বহু-ঈশ্বরধারণা, পৌত্তলিকতা ও অলৌকিকতার আকর মোটেই নয়, বরং অত্যন্ত মহৎ, যুক্তিবাদী ও উন্নত চেতনার দর্শন। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে নিজের সম্প্রদায় হিন্দুদের যে আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে মনে করা হয় তা আসলে কদাচার, নিম্নমানী ও শাস্ত্রসমর্থনহীন। এই দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রামমোহন একাধারে বিদ্যাবাগীশ, ভট্টাচার্য, গোস্বামী, কবিতাকার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারে নেমেছিলেন ; পুস্তিকা প্রকাশ করে সাধারণ শিক্ষিত মানুষকে বিচার-বুদ্ধিতে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এই জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ ও বিচারের পথে ধীর মস্তিষ্কে এগিয়ে যাওয়াই তো শ্রেষ্ঠ পথ। বৈষয়িক বুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান রামমোহনের বিদ্যাবত্তাকে খুব সাবধানে প্রয়োগ করতেই শিখিয়েছিল। নিছক বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী লেখাপড়া কিংবা নিছক আবেগদীপ্ত ধর্ম-সংস্কারের চেষ্টা অনেক সময়েই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। রামমোহনের শাস্ত্রজ্ঞান ও সাংসারিক জ্ঞান সেই বিপদ ঘটতে দেয়নি। কেবল প্রাচীন জ্ঞান ও বিশ্বাসকে নতুন যুগের যুক্তিবাদের আলোয় যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে তিনি নিন্দা-কুৎসা-বিবাদ-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এইটুকু তো সব সংস্কারকেরই প্রাপ্য। সৌভাগ্যের বিষয় এই, রামমোহনের দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষকে অযথা নিন্দা ও

কুৎসাকারীকে কোন অসংযত আঘাত করতে দেখা যায় নি। 'ধর্মসভা'-র মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র নিন্দাবাদ ও ব্যক্তিগত আক্রমণে যদি কিছুটা সত্য থাকে তবু এসব সম্পর্কে নিরুত্তর রামমোহনকে সাধুবাদ দিতে হয় এই জন্য যে, ব্যক্তিগত স্খলন-পতনের মধ্য দিয়েও রামমোহন তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাটি শেষ পর্যন্ত অভীষ্ট হিসাবে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিশ্বনিন্দুক হওয়ার চেয়ে দুর্বল মানুষের আত্ম-সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেক বেশী কাম্য।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন তখন দেশে সহমরণ প্রথা নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছিল। মুঘল সম্রাট আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ শাসনের পর মিশনারীদের মধ্যেও এই সহমরণ প্রথা তুলে দেবার চেষ্টা চলছিল। লর্ড ওয়েলেসলী এই প্রথাকে দমন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানা নিয়মকানুন করেও একেবারে বন্ধ করার কোনো চেষ্টা হয়নি। রামমোহন কলকাতায় এসেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮১৮ সালে রামমোহন এবিষয়ে ইংরিজি ও বাংলায় দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন: 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি পরের বছরই বেরোয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সমাজে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। হিন্দুসমাজের সংস্কারে এই প্রথা-বিরোধিতা তুমুল প্রতিক্রিয়া আনবে জেনেও রামমোহন চাইতেন বিতর্ক ও প্রচারের মাধ্যমে এই বীভৎস প্রথা তুলতে হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে যে উদারনীতি ও যুক্তিনিষ্ঠা রামমোহনকে হিন্দু শাস্ত্র বিচারে সত্যান্বেষী ও যুক্তিবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেই একই

উদারনৈতিক যুক্তিনিষ্ঠা এই সমাজ-সংস্কার-চেষ্টাতেও লক্ষ্য করা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় আচার-বিচার নিয়ে মা-র সঙ্গে রামমোহনের মনোমালিন্য হলেও সাধারণভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা নিয়েও তাঁকে উদ্বুদ্ধ হতে দেখি। উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষের মতো নারীরও যে সম্পত্তি পাবার অধিকার থাকা উচিত এই বোধ রামমোহনের ছিলো বলে তিনি ১৮২২ সালে 'Brief remarks regarding modern encroachments of the ancient rights of females' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে উত্তরাধিকার-সূত্রে নারীর প্রতি সামাজিক সুবিচার প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে তিনি শুধু আইনের যুক্তিকেই আনতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে রামমোনের ব্যক্তিত্বের আর একটি দিকের কথা সংক্ষেপে বলে নিতে হয়। সেটি হল, দেশীয় অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা। ভারত পথিক রামমোহনের দার্শনিক ব্যক্তিত্ব, আত্মীয় সভা, ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি, ব্রাহ্ম সমাজ ও বেদান্ত কলেজের স্থাপয়িতা রামমোহনের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের সামাজিক ব্যক্তিত্বের কথাই পরবর্তী কালে বেশী আলোচিত হয়েছে। তুলনায় রামমোহনের রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ কম। দিল্লীর বাদশাহের দৌত্য ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে তিনি যে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন সেকথাও রামমোহনের জীবনী-পাঠকের জানা। কিন্তু দু'বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করার সময়ে ভারতবর্ষের— বিশেষত এই পূর্বাঞ্চলের-অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তিনি শুল্কও কৃষি সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীকালে

বেশী হয়নি। সাংবাদিক হিসাবে রামমোহনের আত্ম-প্রকাশের একটু আগে থেকেই তখনকার সংবাদপত্রে অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকত। 'কৃষি কর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য', 'ক্রোনাইজেমিয়ান' অর্থাৎ ইংরেজ লোকের এদেশে চাষবাস বিষয়ক, 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'চরকাকাটনির দরখাস্ত' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির অনেকগুলি রামমোহনের অর্থনৈতিক আলোচনার আগে প্রকাশিত। কিন্তু সেগুলি কোনো সুসম্বদ্ধ তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী আলোচনা নয়। অর্থ-নৈতিক আলোচনায় রামমোহন সে যুগে একাকিত্বে বিশিষ্ট।

রামমোহন যখন কৈশোর থেকে যৌবনে এসেছেন তখন দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল রামমোহন তখন টের পাচ্ছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭৬) অসংখ্য শিশু মৃত্যুর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পূর্বভারতে পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা তুলনায় কম। কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে জমিদারের দেয় রাজস্ব-হিসাবে যে পরিমাণ টাকা স্থায়ীভাবে স্থির করে দেন সেটা তখন প্রজাদের দেয় খাজনার দশভাগের নয়ভাগ। কর্ণওয়ালিশের আশা ছিল, জমির জন্যে চাহিদা বাড়ার ফলে জমিদারের প্রাপ্য খাজনা এবং নীট লাভ দ্রুতগতিতে বাড়বে। কিন্তু আসলে দেখা গেল, জমিদাররাই প্রজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পুরো খাজনা আদায় হচ্ছে না, বরং বাকী রাজস্বের দায়ে জমিদারী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পরে আইন করে (১৭৯৯) জমিদারের ক্ষমতা বাড়ানো হলো, যাতে তাঁরা প্রজার কাছ থেকে খাজনা সহজে আদায় করতে পারেন। আবার ১৮১২ সালে আইন পাশ করে জমিদারের ক্ষমতা কমানো হলো। আর তার দশ বছর

খাদে কোম্পানীর সরকার রায়তদের খাজনা ঠিক করে দেবার অধিকার নিলেন। বোঝাই যায়, রায়তদের উপর চাপ ক্রমশ বেড়েই চলছিল।

রামমোহনের জীবনী থেকে জানতে পারি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিরাজস্ব বিভাগে রামমোহন দশ বছর (১৮০৫-১৮১৫) কাজ করেছিলেন। প্রথমে ছিলেন মুন্সী, পরে সেরেস্তাদার এবং তারও পরে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন তিনি। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য আইনের আওতায় থেকেই তাঁকে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে থাকতে হয়েছে। বিবেক মানুক্ না মানুক, তাঁকে রাজস্ব আদায় করতে হয়েছে। তখনকার দিনে কালেক্‌টররা ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়েই কাজ করাতেন। কোম্পানির সনদ যখন নতুন করে পার্লামেণ্টে পাশ করানো হবে তখন পার্লামেণ্ট থেকে একটি 'সিলেক্ট কমিটি' তৈরি করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কী কী বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন তার অভিমত নেওয়া হতো। এই সিলেক্ট কমিটি প্রেরিত প্রশ্নাবলির যে উত্তর রামমোহন দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন যে কটি প্রবন্ধ, তাতেই রামমোহন অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। রামমোহন যখন এই অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলির উত্তর দিয়েছেন তখন অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত বই Wealth of Nations, ম্যালথাস ও রিকার্ডোর লেখা চতুর্দিকে প্রচারিত। ভারতের করনীতি ও মূলধন সম্পর্কে যে মন্তব্য রামমোহন করেছেন, এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজ্ঞান ও মূলধনের অংশভাগী হয়ে উত্তর অ্যামেরিকার উন্নতি সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য তিনি করেছেন তাতে স্মিথ ও রিকার্ডোর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বলে সাম্প্রতিক অর্থনীতি

বিদ্রাই মন্তব্য করেছেন। এমনকি ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ ও সামাজিক রীতিনীতি-সম্ভূত জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং মহামারী ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রামমোহনের আছে তাতেও ম্যালথাসের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বলে অর্থনীতিবিদ্ মন্তব্য করেছেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে রামমোহন যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে অর্থনীতিবিদের অনুমান, রামমোহন ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত কোলব্রুকের 'হাজব্যানড্রি ইন বেঙ্গল' বইটি পড়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকতে রামমোহনের সঙ্গে দার্শনিক বেন্থামের আলাপ হয়েছিল। সম্ভবত দু'বার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। বেন্থাম-রামমোহন পত্রাবলীর মধ্যে জেমস মিল-এর উল্লেখ আছে: মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কে বইও রামমোহন পড়েছিলেন বলেই মনে হয়।

যে অর্থনীতির ভূমিকায় রামমোহনের মতামত তৈরি হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় দিক ভূমি রাজস্ব ও কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কিত। মনে রাখতে হবে, তখন ভারতের কুটিরশিল্প অবনতির পথে, কিন্তু আধুনিক শিল্প তখনো শুরু হয়নি। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব তখন পুরোদমে চলছে। ফলে ভারতের কুটিরশিল্পজাত সূক্ষ্ম কাপড়ের ইংল্যাণ্ডে আমদানি ইংরেজ সরকার বন্ধ করেছেন উঁচু হারে কর বসিয়ে; অন্যদিকে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় ছেয়ে গেছে। এই পটভূমিতে শহরাঞ্চল-কলকাতায় যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তারা কোম্পানীর সরকারী চাকুরে, নতুন ধরনের ব্যবসায়ী এবং গ্রামের জমিদারীতে অনুপস্থিত শহরবাসী মালিক। রামমোহন এই শেষোক্ত শ্রেণীতেই পড়েছিলেন। বিশেষত, ১৮১৬ সালের পর

থেকে যখন তিনি জমিদারী সম্পত্তি কিনে রংপুরের চাকরী ছেড়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন। রামমোহনের অর্থনৈতিক আলোচনাতে আমদানি-রপ্তানি, সরকারী ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উল্লেখ থাকলেও ভূমি ও কৃষি সমস্যাই প্রধান অংশ নিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই আলোচনাতে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কৃষক প্রজার অনুকূলে। জমিদারের নানা প্রকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জমিদারেব দেয় রাজস্ব কমাবার প্রস্তাব তিনি অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহানুভূতি কোনদিকে ছিল সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদেরও সন্দেহের অবকাশ নেই। রামমোহন তীব্র ভাষাতে বলেছেন, 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না, তাদেব দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থির করা হবে না কেন, কেনই বা স্বাভাবিক-ভাবে সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধি শক্ত হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।'

রায়তের দেয় খাজনা যদি আর বাড়ানো না হয় এবং জমিদারের দেয় রাজস্ব যদি কিছুটা কমানো হয়, তাহলে কোম্পানি সরকারের আয়-ব্যয়ের ক্ষতি হবে। এটা রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্যই তিনি বলেছিলেন, ভূমি রাজস্ব থেকে আয় কমলে সরকার আয় বাড়াতে পারেন বিলাস দ্রব্য ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর বসিয়ে, এবং ব্যয় কমাতে পারবেন ইংরেজ কর্মচারীর জায়গায় ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে। তখনকার দিনে লবণ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসানো হতো বেশী

রাজস্বের আশায়। রামমোহনই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাস দ্রব্যের উপর কর বসাতে বললেন। আজকের অর্থনীতির ছাত্র জানেন, ভারতবর্ষের সরকারী আয়ের একটা বড় অংশ আসে বিলাস-দ্রব্য থেকে। বিলাস দ্রব্যের ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের আয় অনেক এবং কর বাড়লেও তাদের ব্যয় কমবার সম্ভাবনা কম। কাজেই আধ্যাত্মিক চিন্তার পথে যে রামমোহন সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টি মেলে ধরেছিলেন সেই রামমোহনই নিজে রাজস্ব আদায়ের কাজে থেকে এবং গ্রামে-অনুপস্থিত শহরবাসী জমিদার হয়ে বিবেক দংশনে এই মতে পৌঁছেছিলেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় শুধু জমিদারের নয়, চাষীদেরও সচ্ছল করতে হবে—জমিদারী অত্যাচারের প্রতিকার হিসাবে। যদিও জমিদারী প্রথা উঠে যাক এটা তিনি বলেন নি, কিন্তু প্রচলিত প্রথার মধ্যেই সমবণ্টনের মাধ্যমে গরীব মানুষের অবস্থার উন্নতি-কামনাও কোন সমকালীন ভারতীয় অর্থ-চিন্তায় ছিল না।

একই উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী মন কাজ করেছে রামমোহনের শিক্ষাচিন্তায়। যে সময় রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পুস্তিকা গুলি বেরোচ্ছে—গত শতাব্দীর কুড়ির দশকে—সেই সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভবিষ্যত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছিল। এক পক্ষের মত ছিল, এদেশে ইংরিজি শিক্ষা না দিয়ে সংস্কৃত ও ফারসী শেখানোই সঙ্গত। অন্য পক্ষ ইংরিজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে 'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাশন'-এর তৎকালীন সেক্রেটারী উইলসন বিভিন্ন জেলায় জেলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দোষগুণ সম্পর্কে বিস্তৃত খবর নেওয়ার জন্য যখন আদেশ

পত্র পাঠিয়েছেন (সেপ্টেম্বর ১৮২৩) সেই সময়ে রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সমর্থন জানিয়ে লর্ড আর্মহার্স্টকে একটি চিঠি লেখেন। যিনি বেদ-বেদান্তরের ব্যাখ্যা করে হিন্দু শাস্ত্রকে যুগোপযোগী করতে চাইছিলেন, তিনিই সেই চিঠিতে লিখলেন, কঠিন সংস্কৃত ভাষা সাধারণের জ্ঞানের প্রসারে শোচনীয় বাধা। বেদান্ত, মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাও জীবনের কার্যকরী জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যহীন। বৈদান্তিক মায়াবাদ মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে। বরং গণিত, পদর্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর-সংস্থান-বিদ্যা ইত্যাদি যে সমস্ত বিদ্যাচর্চ্চা ক'রে ইয়োরোপীয় জাতি-গুলি উন্নত হয়েছে, দেশের মধ্যে সেই রকম কার্যকরী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার হ'লে শিক্ষানীতির আওতায় থেকে আমাদের দেশ প্রগতিশীল দেশগুলির সমান প্রতিযোগী হবে। লক্ষণীয়, এই চিঠিতে রামমোহন বিশেষভাবেই ইংরিজি শিক্ষার কথা বলেন নি। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে গেলে প্রাথমিকভাবে ইংরিজি ভাষা শিক্ষা তো অপরিহার্য। ইংরিজির মাধ্যমেই দেশীয় ভাষাগুলির উন্নতি হবে-এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ। রামমোহনের বক্তব্য থেকে অনিবার্য-ভাবেই ইংরিজি ভাষা-শিক্ষার কথা এসে পড়ে।

তাই দেখি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগেই ইংলিশ ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ছেলেদের উদারভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে রামমোহন উদ্যোগী হয়েছেন (ইণ্ডিয়ান গেজেট, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৪)। তারপরে ১৮২২ সালে উইলিয়াম অ্যাডামের সহায়তায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠাও রামমোহনের নিজস্ব কীর্তি। স্কচ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কেও তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার ও ছাত্র

সংগ্রহে সাহায্য করেন। ডাফের স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনে প্রাথমিক অনুষ্ঠানে ডাফ যখন ছেলেদের বাইবেলের কপি হাতে দেন তখন ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের শান্ত ক'রে বলেন, উইলসনের মত খ্রীষ্টান যদি হিন্দুশাস্ত্র পড়ে হিন্দু না হয়ে থাকেন, রামমোহন নিজে কোরান পড়ে যদি মুসলমান না হয়ে থাকেন, তাহলে ছাত্রদের বাইবেল পড়তে আপত্তি কোথায়? কাজেই তাঁর মত হলো।

Read & judge for yourself' স্মিথের বইতে উল্লিখিত এই ঘটনা থেকে রামমোহনকে একজন যুক্তিবাদী উদারনৈতিক হিন্দু বলেই তো মনে হয়—যিনি অন্যের শাস্ত্র পড়ে চিন্তা করতে বলেন, জাত চলে যাবার ভয় থেকে মুক্তি দেন ছাত্রদের। সমকালীন হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান অধ্যাপক ডিরোজিও ঠিক একই পদ্ধতিতে ছাত্রদের 'র‍্যাশানালিষ্ট' হতে বলেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিও যে মুক্ত চিন্তার প্রবর্তক বলে সম্মানিত সেই মুক্ত চিন্তা তো সমকালীন রামমোহনের মধ্যেও ছিল। দুজনের মানসিকতার এই মিল দেখে মনে হয়, দুজনেই পরস্পরের প্রিয় ছাত্র বা শিক্ষক হতে পারতেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনকে দোষারোপ করার ব্যাপারে বিতর্ক থাকলেও লোকশিক্ষা-প্রচারে তাঁর উৎসাহ ছিল। তার প্রমাণ স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ইংরিজি ও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ভূগোলের বই। গৌড়ীয় ব্যাকরণও এই সোসাইটি থেকেই বেরিয়েছিল। ধর্ম সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন যে পরিমাণে মুক্তমনা যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যাপারেও ঠিক তাই। তবে, রাজনৈতিক চেতনায় তাঁর

মানসিকতা আন্তর্জাতিক চেতনায় উদার ও ব্যাপক। স্বেচ্ছাচারী রাজার কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আদায় করেও নেপ্‌ল্‌স্‌বাসীরা অষ্ট্রীয় সৈন্যদের দাসত্ব নিতে বাধ্য হলে রামমোহন জেম্‌স্‌ সিল্ক বাকিংহামকে চিঠি লিখে নিয়োপলিটানদের দুর্দশায় সমবেদনা জানান এবং মন্তব্য করেন : 'স্বাধীনতার শত্রুদের আমি নিজে শত্রু বলে মনে করি। যারা স্বাধীনতার শত্রু এবং স্বৈরাচারের বন্ধু তারা শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হতে বাধ্য।' স্পেনের স্বেচ্ছাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল রামমোহন বহু ইয়োরোপীয় বন্ধুকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করে ভোজশেষে বক্তৃতায় বলেছিলেন, জাতিগত স্বার্থ, ধর্ম বা ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও এক দেশের মানুষের পরাধীনতার জ্বালায় অন্য দেশের মানুষ কি নির্বিকার থাকতে পারে? ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উদারনৈতিক দলের জয়ের সংবাদে রামমোহন আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে দুটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান দেখে রামমোহন সেই জাহাজ দু'টিতে গিয়ে নিজের আনন্দ জ্ঞাপন করেন—এই খবরও রামমোহনের জীবনী পাঠকের জানা। ইংল্যাণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখন সমতা আসে তাতেও রামমোহনের আনন্দ প্রকাশের খবর আমাদের জানা। ইংল্যাণ্ডে রিফর্ম বিল পাশ হলেও রামমোহন একই রকম আনন্দ প্রকাশ করেন। এছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে আইন প্রবর্ত্তন (Essays on the rights of the Hindus over Ancestral Property according to the Law of Bengal নামে রামমোহন রচনা ১৮৩০ স্মরণীয়), জুরী

প্রথার প্রবর্তন নিয়ে আন্দোলন এবং সব ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধির উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি রামমোহনের কাম্য ছিল। আর, এই ধরনের মানবমুক্তির আন্দোলন-চিন্তা সমকালীন কোন ভারতীয়ের ছিল না।

ইংল্যাণ্ডে রামমোহন কীভাবে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনীকারের সূত্রে সে খবর জানা যায়। শুধু মুঘলবাদশাহদের দৌত্য ছাড়াও অন্য অনেক কারণ ছিল। এমনিতেও তিনি ফ্রান্সের বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রীকে লিখেছিলেন, প্রায় বারো বছর ধরে বিদেশ যাবেন বলে তিনি ভেবে রেখেছেন। তার ওপর সহমরণ প্রথা রহিত করবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আপীল করেছিলেন প্রিভি কাউন্সিলে, তার শুনানী হবার উদ্যোগ হচ্ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নতুন সনদ দেবার কথা হচ্ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও হচ্ছিল। রামমোহন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এইসব ব্যাপারে মতামত দিয়ে শাসন ব্যবস্থায় উদারনীতি প্রবর্তনে চেষ্টা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যে সব মনীষীদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন দার্শনিক বেন্থাম। রামমোহনের উদারনৈতিক যুক্তিবাদ বেন্থামকে মুগ্ধ করেছিল বলে বেন্থাম নিজেই উল্লেখ করেছেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাবার অনুমতিপত্র চেয়ে রামমোহন ফ্রান্সের বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রীকে যে আবেদন করেছিলেন তার মধ্যে রামমোহনের বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিকল্পনার কথা আছে। দুটি দেশের মধ্যে মনকষাকষি থাকলেও মানব-কল্যাণকামী হিসাবে কোনো মানুষ যদি ঐ দুটি দেশের একটি থেকে আর একটিতে যেতে চায় তাহলে

সবরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তাকে যেতে দেওয়া উচিত। মানবিক যোগাযোগের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভেবেও যেতে দেওয়া উচিত। তাছাড়া, দুটি বা ততোধিক দেশের বিরোধিতা মেটাবার জন্য সকল জাতির প্রতিনিধি সমন্বিত একটি কংগ্রেস থাকা প্রয়োজন যেখানে 'All matters of differnce, whether political or commercial affecting the natives of any two civilised countries with constitutional government, might be settled amicably and justy to the satisfaction of both, and profound peace and friendly feelings might be reserved between them from generation to generation.'

একজন ভারতীয়ের চিন্তায় প্রথম ইউনাইটেড নেশন্স-এর এই হলো সূচনা। যৌবনের বিষয়-সম্পত্তির রক্ষক রামমোহন, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেওয়ান রামমোহন, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান শাস্ত্রবিদ রামমোহন শেষ পর্যন্ত সর্বজাতি-সঙ্ঘের পরিকল্পনার রূপকার হিসেবে আন্তর্জাতিক মানসিকতার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। হয়তো তিনি মার্টিন লুথারের মত বিপ্লবী নন, কিন্তু নিজের সমাজ ও ধর্মের যুক্তিবাদী সংস্কারক এবং স্বাধীনতাকামী উদারনৈতিক চিন্তা-নায়ক হিসাবে রামমোহন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা আন্দোলন ও আন্ত-র্জাতিক মৈত্রীর পথ প্রদর্শক।

পাণ্ডিত্য ও মানসিক প্রসার—এই দুটি গুণ মানুষের মধ্যে সব সময় সহাবস্থান করে না। মানসিক প্রসার না থাকলে পাণ্ডিত্য সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা মূল্যহীন হয়েও পড়ে। রামমোহন যে 'চিন্তানায়ক' তার কারণ তাঁর পাণ্ডিত্য দেশের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের, এবং ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্‌নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। রামমোহন সমস্ত রকম মতামত ও আলোচনার জন্যে যে চারটি পথ নিয়েছিলেন (বিদ্যালয়স্থাপন, সভা-সমিতি ডাকা, কথোপকথন ও আলোচনা এবং বই ও পত্রিকা প্রকাশ) তার মধ্যে সংবাদপত্র-প্রকাশ ছিল জনমত সংগঠনের অন্যতম উপায়। রামমোহনের বয়স যখন সাত-আট বছর সেই সময় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবাদপত্র ভারতে প্রথম বেরোয় তা ওয়ারেন হেস্টিংসের মামলার জোরে বন্ধ হয়ে যায় দশমাসের মধ্যেই। তারপর ১৭৯১ সালে Bengal Journal-এ আপত্তিকর অনুচ্ছেদ লেখার জন্যে প্রথমে উইলিয়াম ডুয়ান (Duane) নামে এক সাংবাদিকের জেল হয় ও পরে তাঁকে ইয়োরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'এশিয়াটিক মিরর'-এর সম্পাদক ডঃ ব্রাইস বারবার সেন্‌সরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পাঠান। ১৮২৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা জার্নালের জেম্‌স্ বাকিংহামের লাইসেন্‌স্ কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে দুমাসের মধ্যে ভারত-ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের সমকালেই সাংবাদিকতার ওপর শাসক-গোষ্ঠীর কড়া নজর পড়তে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রবণতার কথা ভেবে রামমোহন শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে সচেতনতা আর সতর্কতা আনবার জন্যেই সংবাদপত্র প্রকাশে মন দেন। পত্রিকা-গুলির নাম 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন'-ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১ সেপ্টেম্বর), সংবাদ কৌমুদী (১৮২১ ডিসেম্বর) এবং মিরাৎ-উল-আখবার (১৮২২ এপ্রিল)। প্রথমটি ইংরিজি, দ্বিতীয়টি বাংলা এবং শেষেরটি ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকের স্থাপিত ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসেবে সংবাদ কৌমুদীই প্রথম। উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ। শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক—সব রকম বিষয়েই তাঁর সংবাদপত্রে আলোচনা থাকতো। কিন্তু রামমোহন জানতেন, শিক্ষিত ভারতবাসীকে এখন থেকে ইংরেজশাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম করে যেতে হবে। বাকিংহামের ভারত-ত্যাগের পনের দিনের মধ্যে সরকারের মুখ্যসচিব সরকারী গেজেটে সংবাদপত্র-বিষয়ক আইনের একটি খসড়া প্রকাশ করলেন। তাতে সংবাদপত্রের জন্যে লাইসেন্স্ নেবার কথা বলা হলো। আইনটি তখন সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের অপেক্ষায়। এই আইনের বিরুদ্ধে যে শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম শুরু হয় (রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই আবেদনই Constitutional agitation বা শাসন-তান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে) তাতে দেখা যায়, ছ-জন দেশ-প্রেমিক বাঙালী সই করে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দাবি পেশ করেন। স্বাক্ষরকারীরা হলেন চন্দ্রকুমার ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং

প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যাই হোক, দাবিটি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে এবং রাজার কাছে অগ্রাহ্য হয়ে ফিরে আসে। এই দাবিটি, রামমোহনের পুত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রামমোহনেরই খসড়া করা এবং দাবির মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের অভাবে ব্রিটিশ শাসন এবং আইনে অভিজ্ঞ যে নেটিভ সম্প্রদায় তারা দেশীয় অন্য লোকেদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের ভালো দিক-গুলো বুঝিয়ে বলবার উপায় খুঁজে পাবে না। এবং সরকার পক্ষে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি হবে সে সব সম্পর্কে দেশীয় মানুষের অভিযোগ রাজা বা কাউনসিলের কাছেও পৌঁছোবে না। সরকারের উচিত, সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার খাতিরে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু দিয়ে দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কাজেই মূল কথা হলো, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, প্রায় একশো বছর বাদে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে যে কণ্ঠরোধ বা 'gagged silence'-এর কথা বলেছিলেন সেই কণ্ঠরোধের আশঙ্কাই রামমোহন করেছিলেন ওই দাবিতে, যাতে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকা-নাথেরও স্বাক্ষর ছিল। রামমোহনের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেবার জন্যে মাঝে মাঝে কমিশন নিযুক্ত করা। অবশ্য তাঁর মতে এই শ্রমসাধ্য কাজটির চেয়ে স্বাধীন সংবাদপত্রই সহজে দেশীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ফুটিয়ে তুলতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট এই দাবি অগ্রাহ্য করলে রাজার কাছে তিনি আবেদন পাঠান। তাতে রামমোহন চেয়েছিলেন, কোনো আইন পাশ করার আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া

হোক। প্রচলিত আইনে আভ্যন্তরীণ রাজকর্মচারীরা তখন নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করতে পারতেন। এই সুপারিশগুলি সপরিষদ বড়লাট বিবেচনা করতেন এবং তাঁরা অনুমোদন করলে সেইভাবে আইন পাশ হতো। রামমোহন বললেন, শুধু রাজ-কর্মচারীরা নয়, সমাজের ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিত্তশালী ব্যক্তিদেরও এ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার দেওয়া হোক। আরও বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি, রামমোহন মনে করতেন, আইনের সঙ্গে শুধু ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারীদের স্বার্থই বিজড়িত। অতি সাধারণ ব্যক্তির জীবনের সঙ্গেও যে আইনের সম্পর্ক আছে এবং প্রত্যেক বয়স্ক ও সুস্থ ব্যক্তির যে আইন প্রণয়নে অংশ নেবার অধিকার থাকা উচিত এ ধারণা তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই গৃহীত হয় নি। বেন্থামের মতো কেউ কেউ সাধারণের ভোটাধিকারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আদর্শকে ইউটোপিয়ান বলা হতো। রামমোহন এই ইউটোপিয়ান আদর্শে বিশ্বাস করতেন না এবং সেইজন্যে তখনকার অবস্থায় পূর্ণ গণতন্ত্রের কথা ভাবতেও পারতেন না। সাধারণ ভারতবাসীর শিক্ষার মান সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। কোনো দেশের বিত্তশালী বুদ্ধিমান অভিজাত সম্প্রদায়ই প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা করতে পারবেন, এই কথা বলে রামমোহন অভিজাততন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর দেশপ্রেম ছিল তাঁর এবং জনমতের অভাব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সজ্ঞানও ছিলেন। তখনকার কালে আইন-সভার দাবি করা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহন এটুকু বুঝেছিলেন যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে আলোচনার স্বাধীনতা

দিলে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। বোর্ড অব ডিরেক্টররা ভেবেছিলেন, কাগজে শাসনব্যবস্থার সমালোচনা হলে জনসাধারণের আস্থা হারাবার আশঙ্কা। তাঁরা আরও বলেছিলেন, সংবাদপত্র জনশিক্ষার উপযুক্ত বাহনই নয়। প্রেস রেগুলেশন কার্যকর হলে (১৮২৩) রামমোহন বুঝিয়েছিলেন, স্থানীয় ভাষায় যে চারটি সংবাদপত্র আছে তার সবকটিতেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের খোলাখুলি আলোচনা থাকায় ইতিমধ্যে কিছুটা স্বাস্থ্যকর জনমত গঠিত হয়েছে এবং দেশের সাধারণ অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। উদ্দেশ্য সাধু হলে কোনো সরকারই সংবাদপত্রের সমালোচনাকে ভয় পায় না। রামমোহনের এই বক্তব্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পরেও ঘটনাচক্রে আমাদের বিবেকে হানা দিয়েছে বার বার! যাই হোক, আগেই বলেছি, দেশের শীর্ষস্থানীয়দের মতামত গ্রহণের যে সামান্য দাবিটুকু রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি করেছিলেন তা অন্যান্য দাবির সঙ্গেই অগ্রাহ্য হয়েছিল। জনসাধারণ পর্যন্ত এগোতে না পারলেও ব্যক্তিগত চারিত্রিক আভিজাত্য-প্রবণতায় রামমোহন অন্তত নিজের শ্রেণীভুক্ত দেশীয় মানুষের শাসনতান্ত্রিক অধিকার-দানের কথা ভেবেছিলেন। মনের গভীরে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতিচিন্তা থেকে গিয়েছিল। 'মিরাৎ-উল-আখবারে'ই রামমোহন আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষে relief fund (সাহায্য ভাণ্ডার) খুলে জন-সেবার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গেলে লাইসেন্স নিতে হবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হলে মিরাৎ-উল-আখবার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে রামমোহন যা লিখেছিলেন তা একদিকে যেমন তীব্র বিদ্রূপে পূর্ণ, তেমনি অন্যদিকে সংযত অভিমানে বিষণ্ণ ও

গম্ভীর। বক্তব্যের সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

'প্রধান সেক্রেটারীর সঙ্গে যে-সব ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হলেও আমার মতো সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দরোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যাদের মাধ্যমে এইরকম উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে যাওয়া খুবই দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায়, যা নিষ্প্রয়োজন সেই রকম কাজের জন্যে নানাজাতীয় লোকজনে ভরতি পুলিস-আদালতের দরোজা পার হওয়া কঠিন। কথায় আছে [ফারসি বয়েৎ উদ্ধৃত করে বলেছেন] : যে সম্মান হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দুর বিনিময়ে কেনা, কোনো অনুগ্রহের আশায় সে সম্মান দরোয়ানের কাছে বিক্রি করোনা।'

এর পর নিজেকে সংযত করে তিক্ত অভিমান-ভরে বলেছেন :

'....মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সত্যি কথা বলতে গিয়ে হয়তো এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা সরকারের কাছে অপ্রীতিকর হতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করছি। [হাফিজের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন] : হাফিজ ! তুমি কোণঠাসা ভিখিরি ছাড়া কিছু নও। চুপ করে থাকো। নিজেদের রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব রাজারাই জানেন।'

লেখক হিসেবে রামমোহনের কৃতিত্বের আলোচনা অনেক হয়েছে। বিশেষত বাঙলা গদ্যের লেখক হিসেবে। কাজেই ভাষারীতি-বিজ্ঞানের আলোচনায় না গিয়ে তাঁর ইংরিজি ও বাঙলা রচনা থেকে তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রে পরিচয় যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুকেই তুলে ধরার চেষ্টা করব। প্রথমত রামমোহনের ইংরিজি রচনার কথাই ধরা যাক। তাঁর ইংরিজি রচনাকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তিকার আকারে রচিত প্রবন্ধ। চিঠিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,— হ্যামিল্টনের অভদ্র ব্যবহারের প্রতিকার প্রার্থনা করে লেখা চিঠি, আমহার্স্ট'কে লেখা শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক চিঠি, গর্ডনকে লেখা আত্মজীবনী-মূলক চিঠি, Precepts of Jesus পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর মিশনারিদের আক্রমণের উত্তরে বাল্টিমোরের জনৈক ভদ্রলোককে লেখা চিঠি, নেপ্‌ল্‌সের স্বাধীনতা নষ্ট হবার পর বাকিংহামকে লেখা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষামূলক চিঠি, ইংল্যাণ্ডের রিফর্ম বিল পাশ হবার পর উইলিয়াম র‍্যাথবোনকে লেখা চিঠি, অবসরপ্রাপ্ত ইংল্যাণ্ডবাসী ডিগ্‌বিকে লেখা চিঠি ; জুরি-বিল সম্পর্কে ক্রফোর্ডকে লেখা চিঠি এবং লণ্ডন থেকে প্যারিসে যাবার আগে ফ্রান্সের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীকে লেখা পাশপোর্ট-সংক্রান্ত চিঠি। চিঠিগুলির অধিকাংশই রামমোহনের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতি

সংক্রান্ত আলোচনায় রামমোহনের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সূত্রেও এগুলি উল্লেখিত। হ্যামিল্‌টনের আচরণের প্রতিবাদ করে লর্ড মিন্টোকে রামমোহন যেভাবে চিঠি লিখেছিলেন তাতে একই সঙ্গে আত্মসম্মান ও নির্ভীক দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তেমনি আমহার্স্ট'কে লেখা চিঠিতে রামমোহন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার কঠিন শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পাঠ্যসূচি চেয়েছিলেন, প্রগতিশীল অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিজের দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে চেয়েছিলেন। গর্ডনকে লেখা চিঠির মধ্যে (যদি এ চিঠি প্রামাণিক মনে করা হয়) রামমোহন ব্যক্তিজীবনে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কৈশোরে ও যৌবনে কী কঠিন সংগ্রাম করে প্রাচীনপন্থী সামাজিকদের, এদেশে বসবাসকারী অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের এবং আপন পরিবারের নিকট-আত্মীয়দের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। এবং শেষপর্যন্ত স্বদেশীদের সু-শাসনে রাখবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে সপরিষদ রাজার কাছে আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, সেকথাও তাঁর চিঠি মারফত প্রকাশিত। চিঠি পড়ে মনে হয়, দিল্লীর মুঘল সম্রাটকে স্বদেশী হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর কিছু অধিকারে বিদেশী কোম্পানির অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার করতেই যেন তাঁর দূত হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে গেছেন। বাকিংহাম কিংবা র‍্যাথবোনকে লেখা চিঠিতে রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রীতি, শাসনতান্ত্রিক উদারনীতির প্রতি সমর্থন ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ স্পষ্ট। তাঁর পূর্বতন মনিব অবসরপ্রাপ্ত ডিগ্‌বিকে লেখা চিঠির মধ্যে রামমোহন আমাদের দেশের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা কীভাবে রাজনৈতিক চেতনার বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা নানাভাবে বুঝিয়েছেন এবং ধর্ম ও সংস্কারের জন্যে

রামমোহন যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাও জানিয়েছেন। খ্রীষ্টের উপদেশাবলির সারবত্তা তিনি মেনেছেন, ডিগ্‌বির সঙ্গে একমত হয়েছেন, কিন্তু স্বধর্মে আস্থা কোনোভাবেই হারাননি। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে ইংরিজিতে লেখা আবেদনের মধ্যেও এই একই চরিত্রের প্রকাশ।

ক্রফোর্ডকে লেখা চিঠির মধ্যে বিচার-ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান বাদ দিয়ে খ্রীষ্টানদের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাত দেখানোর বিরুদ্ধে বেশ স্পষ্ট প্রতিবাদ রামমোহন করেছেন। যে ইংরেজ জাতি তাদের পার্লামেন্ট এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির এতো বড়াই করে, সেই শাসক-জাতি যদি বিচার-ব্যবস্থায় এই পক্ষপাত নিয়ে আসে, তাহলে একশো বছর বাদে যখন ভারতীয়রা শিক্ষা-দীক্ষায় অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তখন এই বিশাল দেশের মানুষ বন্ধু হলে তো ভালই,—আর যদি ঘোর শত্রু হয়ে পড়ে তা হলে কি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না? রামমোহনের চিঠিপত্র-আবেদনে এবং প্রবন্ধ-পুস্তিকাতেও এই রকম প্রচ্ছন্ন খোঁচা ও ভীতি-প্রদর্শন থাকতো। ফ্রান্সের বিদেশ দপ্তরের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে রামমোহনের জাতি-সঙ্ঘ-পরিকল্পনা প্রকাশিত। দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত জাতিকে মিলিত করবার যে মহান্ পরিকল্পনার তিনি দ্রষ্টা, তার ভিত্তি ছিল বিশ্বমানবিক সংহতি—কোন সংকীর্ণ ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি বা দেশপ্রীতির স্থান সেখানে ছিল না।

রামমোহনের অন্য ইংরিজি রচনাগুলি বেশির ভাগই পুস্তিকা। কোনোটি বিধবার উত্তরাধিকার বিষয়ে, কোনোটি সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধের প্রতিবাদে, কোনোটি ইয়োরোপীয়দের স্থায়ীভাবে

এদেশে বসবাসের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে, কোনোটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে সুপ্রিম কোর্টের মিতাক্ষরা সম্বন্ধে মতামতের প্রতিবাদে, কোনোটি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে। এছাড়াও তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য লেখা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডিড।

প্রতিটি লেখাতেই বৈষয়িক, আইনজ্ঞ, প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, সমাজকল্যাণমুখী, স্বাধীনতাকামী এবং সংস্কারপন্থী রামমোহনের ব্যক্তিচরিত্র প্রকাশিত। সবার ওপরে উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বমানব রামমোহনকে দেখতে পাই।

রামমোহনের সংস্কৃত ও বাঙলা রচনা ইংরিজি রচনার তুলনায় বেশি না হলেও প্রায় সমান সমান। একেশ্বরবাদের সমর্থনে আরবি ও ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবিতে) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (১৮০৩-৪ খ্রীঃ) 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন'-এ যে শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির প্রকাশ দেখি, সংস্কৃত শাস্ত্রবিচারে এবং বাঙলায় বিচার-বিতর্কের প্রকাশে একই রকম শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবুদ্ধির প্রকাশ দেখতে পাই। বেদান্তের আলোচনায় রামমোহন কর্ম ও জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে, ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব দুই-ই স্বীকার করেছেন। আমহার্স্টকে লেখা পত্রে দেখি, যে বেদান্তবাদী সংসার ও স্বজনকে মিথ্যা মনে ক'রে বৈরাগ্যের আশ্রয় নেন তাঁকে তিনি স্বীকার করতে চান না। তবু মনে রাখতে হবে, তিনি এদেশে নবযুগের প্রথম বেদান্ত-প্রচারক। বেদান্তচর্চা এদেশে সুপ্রচলিত হলেও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে বেদান্তবাদকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা স্মরণীয়।

বৈষয়িক জগতের উন্নতির চেষ্টায় যিনি আজীবন বিতর্ক প্রতিবাদ

ও আবেদন করে গেছেন তিনি সংসারকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। অথচ এই সংসারিক অসংগতির মধ্যে একটি শৃঙ্খলার রূপকার যে ঈশ্বর, তাঁকেই প্রেরণাস্বরূপ রেখে যাবতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে রামমোহন লড়াই করেছেন। দেশে-বিদেশে সর্বত্র মানুষের দাসত্বমুক্তি ও সমানাধিকারে রামমোহনের সমান সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল। ক্ষুরধার যুক্তিবুদ্ধিই রামমোহনকে গোঁড়া হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে চালিত করেছে। যুক্তি খণ্ডনে ও স্থাপনেই তাঁর অধিকাংশ রচনা শেষ হয়েছে। কেবলই যুক্তি-খণ্ডন রামমোহনের বিতর্কপ্রবন্ধকে নীরস করেছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ হঠাৎ ঝলসে উঠেছে। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে' রামমোহন বলছেন: 'ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি [,] যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।' কিংবা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে হঠাৎ বলে ফেলেছেন: 'রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক [,] বিশেষ এইমাত্র [,] রাজাদের নিমিত্ত যে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্যাপ্ত হয় [,] ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।'

অনেক সময় বিরুদ্ধপক্ষের প্রতি ধারালো আক্রমণে রামমোহন তাঁর ভাষাগত আভিজাত্য ছেড়ে তীব্র বেগে প্রায় খাঁটি বাঙলায় চলে এসেছেন। 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদে' নিবর্তকরূপী রামমোহন বলে উঠেছেন: 'তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর [,] পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ওই বিধবা উঠিতে না পারে [,] তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ

দিয়া ছুপিয়া রাখ।'

'কবিতাকারের সহিত বিচারে' রামমোহনের বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ বোধ-হয় সবচেয়ে ধারালো। কবিতাকার যখন এই বলে আক্রমণ করেছেন, একালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা জাহির করে বেড়ায় যে তারা ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানীরা মৌনই থাকেন,—তার উত্তরে রামমোহন লিখছেন: 'আমরা পৌত্তলিক নহি যে দীর্ঘ তিলকছাপা ও খোল কর্ত্তালের সহিত নগর কীর্ত্তন করিয়া অথবা সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান ও নৃত্যগীতের দ্বারা আপন উপাসনা অন্যকে জানাইব....।'

রামমোহন ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যবনের মত পোশাক পরে দরবারে যান বলে কবিতাকার যখন আক্রমণ করেছেন, তখন রামমোহন তীব্র পাল্টা আক্রমণে বলেছেন: 'যদ্যপি এমত সকল তুচ্ছকথার উত্তর দিবাতে লজ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্বাবধি স্বীকার করা গিয়াছে সুতরাং উত্তর দিতেছি [,] আদৌ ধর্ম্মাধর্ম্ম এসকল অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন [,] পরিধানাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে [,] দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করি যে শিল্পবস্ত্রমাত্র যদি যবনের পোষাক হয় তবে কবিতাকার এবং তাঁহার বান্ধব অনেক পৌত্তলিকেই শিল্পবস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাইয়া থাকেন [,] যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকার উপাসক ব্রাহ্মণ্যাদির শিল্পবস্ত্র পরিধান করিবাতে দোষ নাই [,] কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর দিবসের মধ্যে এতকাল পর্যন্ত পরিলে দোষ নাই অতকাল পর্যন্ত পরিলে দোষ হয় [,] ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন, তখন এবিষয়ে অবশ্য বিবেচনা করিব। বিশেষতঃ কবিতাকার পাষণ্ড, নাস্তিক ইত্যাদি ক্ষুদ্র

কটূশব্দ আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেও কবিতা-কারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে [,] কারণ কুপথ্যসেবী রোগী কিম্বা বালককে ঔষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্বাক্য কহিয়া থাকে....।'

২

রামমোহনের বিচার-বিতর্কগুলি সব চেয়ে বেশি সাহিত্যিক গুণ পেয়েছে কথোপকথনমূলক রচনার নাটকীয় সংলাপে। একাধারে তীব্র ব্যঙ্গ ও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রথম শ্রেণীর স্যাটায়ারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই রকম সাহিত্যিক গুণের সবচেয়ে সরস প্রকাশ হয়েছে 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' রচনায়। পাদরি একবার বলছেন, 'এক ঈশ্বর হয়েন' ; আবার বলছেন, 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং ধর্মাত্মা ঈশ্বর।' এই পরস্পরবিরোধী কথা বলার পরে পাদরি যখন তিন চৈনিক শিষ্যকে বললেন, এবার বলো, ঈশ্বর ক'জন, তখন প্রথম জন বলেছে যে, ঈশ্বর তিনজন, কিন্তু 'তিনে মিলে এক হয়েন' ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। নেহাত পাদরি নিজেই ঈশ্বর তিন-জন বলেছিলেন বলেই সে ঈশ্বর তিনজন বলেতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয় জন বলেছে, সে পাদরির বক্তৃতায় প্রথমে ভেবেছিল ঈশ্বর অনেক। কিন্তু পাদরি কমিয়ে মোটে তিন জন বলায় শেষ পর্যন্ত সে আরও কমিয়ে দুজন বলেছে। তৃতীয় শিষ্য পাদরির কাছে সব শুনেও গম্ভীর হয়ে বললে, আপনার বক্তৃতা শুনে মনে হলো, ঈশ্বর নেই। পাদরি শুনে চমকে গেলেন। তৃতীয় শিষ্য তখন বললে, এক বস্তু বর্তমান থাকতে থাকতে যদি তার স্থানান্তর ঘটে, তখন সে বস্তুর অভাবই তো ঘটে। পাদরি আবার বিস্মিত হলেন। তখন সেই শিষ্য বুঝিয়ে বললে, 'পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ঈশ্বর ছিলেন না এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন [,]

কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?' অর্থাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুতে ঈশ্বরের স্থানান্তর ঘটেছে। অতএব ঈশ্বরের অভাব ঘটেছে, ঈশ্বর নেই।

রামমোহন সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেউ ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি যে তার্কিক রামমোহনের মধ্যে এক রসিক রামমোহন বাস করতেন, যিনি নীতিকথার অদ্বিতীয় রূপকার ঈশপের মতো গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দিতেন যে, বুঝেসুঝে শাস্ত্র পড়তে হয়। আর শাস্ত্রানুবাদ ও তার ভূমিকা এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যার কথা বাদ দিলে অন্তত 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' কিংবা 'কবিতাকারের সহিত বিচার' কিংবা 'পাদরি ও শিষ্য সংবাদ' ইত্যাদি রচনা থেকে যে যে অংশ পড়া হলো তাতে কি মনে হয়েছে যে, এতটুকু অন্বয়গত অস্পষ্টতায় বা দুরূহ শব্দের ধাক্কায় রসিকতা মাঠে মারা গেছে? একালের চোখে এই বিবাদ-বিতর্কের সরসতায় আজও আমরা সমান মুগ্ধ। সেকালের ঈশ্বর গুপ্তের কথা এক হিসেবে খুবই সত্য যে—'দেওয়ানজী জলের ন্যায় বাঙ্গলা লিখিতেন।' আসলে সেই ফোর্ট উইলিয়ামী গদ্যের পরিবেশে রামমোহনই প্রথম লেখক যিনি বিচার-বিতর্কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঝে মাঝে সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন। সাধারণভাবে তিনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী, সংযত, গম্ভীর এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডনে আমাদের সব সময় সতর্ক করে রাখেন, কিন্তু আক্রমণের মুখে তিনি তাঁর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ মুখোশ সরিয়ে মাঝে মাঝে হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী প্রকাশ করেছেন।

আজকের দৃষ্টিতে যে যুগের গদ্য প্রায় অনেকটাই দুষ্পাঠ্য সেই যুগেও রামমোহন ভাষার সরলীকরণে মন দিয়েছিলেন, সংস্কৃতের ঘন সন্নিবিষ্ট বাক্যগঠনে বাঙলার ধাত বুঝে ছড়িয়ে শিথিল করে বলতে চেয়েছিলেন, বিচারকে সহজবোধ্য করতে চেয়েছিলেন—আজকের দিনে তা যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে' তিনি বলেছিলেন, ভট্টাচার্য তাঁর রচনাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছেন দুরূহ সংস্কৃত শব্দে। পরিচ্ছন্ন বাক্যগঠনে সব সময়েই তিনি মনোযোগী হয়েছেন, কিন্তু যতিচিহ্ন প্রয়োগের অভ্যাস বাঙলা গদ্যে তখনও প্রায় আসেনি বলেই মাঝে মাঝে ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে তাঁর বাক্য। আর স্কুল বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে প্রকাশিত তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' পড়লে দেখা যাবে সম্পূর্ণ একখানি বাঙলা ব্যাকরণই তিনি লিখতে চেয়েছিলেন—অত্যন্ত সহজ ভাষায়—বাঙলা শব্দ ও ক্রিয়াপদের উদাহরণ দিয়ে—পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা যে বাঙলা ব্যাকরণকে আবার সংস্কৃতের সূত্রবন্দী করে ফেলেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই বেশ কিছু উদাহরণে বাঙলা শব্দ পাওয়া যাবে, কিছু প্রয়োগও পাওয়া যাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে, কতখানি পরিচ্ছন্ন বাঙলায় রামমোহন তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময়ে কর্মবাচ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙলা প্রয়োগ আগে দিয়ে পরে সংস্কৃতের কাছাকাছি প্রয়োগ দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেক সময়ে বাঙলা প্রয়োগ দিয়ে সংস্কৃত থেকে ব্যুৎপত্তির ক্রমটিও দেখিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া উদাহরণ হিসাবে ভাজ, মাসী, মেসো, বামনাই, ঘর, পাগলী ইত্যাদি শব্দগুলি উপভোগ্য মনে হয়। চলতি বাঙলাকেই তিনি ব্যাকরণে আনতে চাইছেন বোঝা যায়।

রামমোহনের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা যেমন সমাজকল্যাণমুখী ছিল তেমনি ভাষাগত পরিচ্ছন্নতার মূলেও ওই একই প্রবণতা কাজ করেছে। সমাজকল্যাণই যাঁর লক্ষ্য, বহুজনের মঙ্গলই যাঁর ব্রত, সমাজ ধর্ম শিক্ষা রাজনীতির ক্ষেত্রে আধুনিকতা ও গণতান্ত্রিকতাই যাঁর লক্ষ্য, লেখক হিসেবে পাঠকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপনে তৎপর হয়ে তিনি যে ভাষাকে সহজবোধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ করতে এগিয়ে যাবেন, বাক্যগঠনে ও শব্দনির্বাচনে তিনি যে অর্থগত স্বচ্ছতাকেই লক্ষ্য রাখবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই বিতর্কবিচারের ক্ষেত্রে রামমোহনের অসাধারণ মনীষা যেমন যুক্তিতর্কনির্ভর সংহত প্রবন্ধ রচনার জন্ম দিয়েছে, তেমনি এ-জাতীয় প্রবন্ধে চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও 'যুগোপ-যোগী' স্বচ্ছতা তাঁরই দান। বিরুদ্ধবাদীদের লেখা 'বেদান্তচন্দ্রিকা', 'বিধায়ক নিষেধক সম্বাদ' কিংবা 'পাষণ্ডপীড়ন' পড়লে বোঝা যায়, রামমোহন-বিরোধীরা বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ রচনায় রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্য বাঙলা লিখতেন এবং অনেক সময়েই ইংরিজি বিদ্যার অভিমানে যেমন আমরা ইংরিজি ভঙ্গিতে বাঙলা লিখে বসি, তেমনি মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি পণ্ডিতেরা ক্রিয়াপদ ছাড়া প্রায় সংস্কৃত বাক্যই লিখে গেছেন। কাজেই এখনকার দৃষ্টিতে দেওয়ান-জীর জলের মত বাঙলাকে ইঁটের মতো শক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষের গদ্য পড়লে মনে হয় দীর্ঘসমাসযুক্ত কাদম্বরীর গদ্য পড়ছি আর রামমোহনের গদ্য, তুলনায় অনেকটা যেন, শ্বাসপর্বের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। বরং রামমোহন বেদান্তগ্রন্থে যে অনুবাদ-ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং যে ভঙ্গিতে শ্লোক তুলে তুলে ব্যাখ্যা করেছেন, 'পাষণ্ডপীড়নে' অনেকটা সেইরকম কিংবা আরও দীর্ঘ-

বিলম্বিত বাক্য দেখতে পাই। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করতে রামমোহন এতই তৎপর যে, যে-দু'চারটি অন্বয়গত অস্পষ্টতা থাকে, তা কাটিয়ে উঠতে পারলে স্পষ্টতই অর্থবোধ হয়। কাজেই ধর্ম সমাজ শিক্ষা রাজনীতির মতো রচনাগত সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে যুগের কথা ভাবলে রামমোহন সব সময়েই যুগোত্তীর্ণ।

লেখক রামমোহনের আর একটি নিভৃত গোপন সত্তা ছিল। সে সত্তার কথা না বললে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। যে রামমোহন আযৌবন বিষয়-সম্পত্তি দেখেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করেছেন, তেজারতির ব্যবসা করেছেন, সিভিলিয়ানের দেওয়ানগিরি করেছেন, বিলাসিতা করেছেন, মার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, অভিমানে আত্মীয়দের যথোচিত সাহায্য থেকে নিরস্ত থেকেছেন, ধর্মসংস্কারে নানা সম্প্রদায়ের নিন্দে-মন্দ কুড়িয়েছেন, গোষ্ঠী করে নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন, সঙ্গী পেয়েছেন, সঙ্গী হারিয়েছেন, হতাশ না হয়ে সংগ্রাম করে গেছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতির সংস্পর্শে এসে দেশবাসীর পরাধীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন, সেই রামমোহনের মনের মধ্যে এক ধ্যানস্তব্ধ ঐক্যসচেতন নিরাসক্ত সত্তা বাস করতো। সে সত্তাটি সংসার বিমুখ ছিল না, বরং সংসারে বিশ্ববিধানের একটি ঐক্যবোধক শৃঙ্খলাকে খুঁজতে উন্মুখ হয়েছিল। এই উন্মুখীনতার সূচনা 'তুহ্‌ফাৎ' রচনার সময়, আর পূর্ণতা ঘটেছিল আত্মীয় সভা, ইউনিট্যারিয়ান সোসাইটি এবং ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এক বিশ্বব্যাপ্ত শৃঙ্খলায় যিনি বস্তুজগৎকে বেঁধে রেখেছেন সেই ব্রহ্মের চিন্তাই তাঁকে ফিজিক্যাল সায়ান্স-শিক্ষার দিকে টেনেছিল। আবার বস্তুজগতে যেমন আইনের ব্যতিক্রমহীন রাজত্ব, সামাজিক জীবনেও

তাই হওয়া চাই—এই বোধ থেকেই তিনি হ্যামিল্‌টনের অপমানের প্রতিবাদে আইনের সমদৃষ্টির কথা তুলেছিলেন। সেই জন্যেই তাঁর ব্রহ্ম মানবব্রহ্ম—যে ধর্মমতেই থাকুক, বুদ্ধিবিচার থেকেই মানুষ সেই ঐক্য-বিধায়ক ঈশ্বরকে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবে। এই উপলব্ধিতে আসতে গিয়ে সংসারে যে কষ্ট মানুষ পাবে, সেই কষ্টকে নির্বিকার ভাবে সহ্য করবার ক্ষমতাই হলো বৈরাগ্য। রামমোহন এই বৈরাগ্যকেই মৃত্যু পর্যন্ত পাথেয় করে নিয়েছিলেন। তাই এই জীবনে মৃত্যুরীতির কথা বারবার মনে রেখেই নির্বিকারভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বমানবের সমতার কথাই তিনি চিন্তা করে-ছিলেন। রামমোহনের সঙ্গীত-ভাবনায় সংসারের দম্ভ, বিলাসিতা, পরনিন্দা, অভিমানের ধুলোকাদামাখা পরিবেশের মধ্যে ঐক্যধ্যানী বিনম্র বিষণ্ণ মানুষটিকেই চোখে পড়ে। মানুষের জীবনের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন :

অতএব সাবধান
ত্যজ দম্ভ অভিমান
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

বৈরাগ্যের এই অভ্যাসে, বিবেকের এই পরীক্ষায় এবং সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে বহুবর্ণময় রামমোহনের চরম উপলব্ধিটি কী তা আরেকটি গানে প্রকাশ পেয়েছে :

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা।
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;
তোমার প্রভাব দেখি, না থাকি একাকী।

সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে যে রামমোহন গণহিত-সচেতন, সমাজকল্যাণমুখী, প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, প্রতিবেদনশীল, শ্লেষবিদ্রূপ-পরায়ণ ও রসিক, সেই রামমোহন যখন স্রষ্টা—শিল্পী, তখন তিনি যেন স্বজন-বিচ্ছিন্ন বড় একাকী হয়ে গানের নিঃসঙ্গ ভেলায় একমাত্র ঈশ্বরকে সঙ্গী করে মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি শুনতে শুনতে এগিয়ে গেছেন।

পরিশিষ্ট

রামমোহনের আত্মকথা মূলক চিঠি

রামমোহন রায়ের আত্মপরিচয়-মূলক যে চিঠিটি এই আলোচনার পরিশিষ্টে ছাপা হলো, বলা বাহুল্য, তা অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ 'আত্মজীবনী' নয়। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক চিন্তানায়ক হিসেবে রামমোহন রায়ের যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরেই বলতে পারি, এই চিঠিতে যেহেতু তাঁরই নিজের লেখা আত্মপরিচয় বিবৃত হয়েছে, এবং নিছক আত্মপরিচয়দানের উদ্দেশ্যেই চিঠিটি লেখা সেইজন্যে আত্মকথার ইতিহাসে আধুনিক যুগের প্রথম ভারতীয় মহামানবের এই আত্মপরিচয়টুকুর বিশেষ মূল্য আছে। তাই রামমোহনের আত্মজীবনী-মূলক চিঠিটি দিয়েই এই আলোচনার ছেদ টানছি।

কিন্তু রামমোহনের এই চিঠিটির প্রামাণিকতা নিয়ে একটু বিতর্ক হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুর পরেই ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এথেনিয়াম কাগজে রামমোহনের ইংল্যাণ্ডস্থিত সেক্রেটারি স্যানফোর্ড আর্ণট এই চিঠি প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রানসে যাবার ঠিক আগেই কলকাতার এক বন্ধু গর্ডনকে এই চিঠিটি লেখা বলে ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার মনে করেন। কিন্তু চিঠিটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই টাইম্স্ পত্রিকায় (১৮৩৩, ২৮শে অক্টোবর) জন হেয়ার এই চিঠির প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। পরে ওই বছরই নভেম্বর মাসে টাইম্স্ পত্রিকাতেই চিঠিটি যে প্রামাণিক তা আর্ণট জোরের সঙ্গেই বলেন। কিন্তু রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কোলেট চিঠিটির প্রামাণিকতাকে মানতে চান নি, যদিও কোন

যুক্তিতে মানতে চান না তা তিনি বলেন নি। কিন্তু অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মূলর যে মন্তব্য করেছিলেন তা এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : 'রাজা চিঠিটি লিখেছেন কিংবা মুখে বলেছেন এবং অন্যে লিখে গেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও সম্পূর্ণ চিঠিটিকে জাল বলে উড়িয়ে দেওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হবে।' (দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেটের 'দি লাইফ অ্যাণ্ড লেটার্স অব রাজা রামমোহন রায়, পরিশিষ্ট ৮ দ্রষ্টব্য)

ম্যাক্‌স্‌মূলরের অনুসরণে এইটুকু বলতে পারি, চিঠিটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না এই কারণে যে, চিঠিতে রামমোহনের বংশবৃত্তান্ত, পূর্ব-পুরুষের ধর্মবোধ, বৈষয়িক কাজকর্মে মনোযোগ, মাতৃকুলের ধর্মীয় কাজকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই রামমোহনের জীবনসংক্রান্ত অন্যান্য সূত্র ও রামমোহনের চিঠিপত্র থেকেও সমর্থিত হয়। তেমনি চিঠিতে উল্লিখিত রামমোহনের ফার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা, পরে সংস্কৃত ও ইংরিজি শিক্ষার প্রমাণও তাঁর গ্রন্থাবলির প্রকাশক্রম অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে। চিঠিতে যে দেশভ্রমণের কথা আছে সে ভ্রমণ কোন কোন অঞ্চলে তার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ না থাকলেও 'তুহ্‌ফাৎ'-এর ভূমিকাতেও ওই বিদেশ ভ্রমণের কথা আছে। ফিরে এসে তিনি ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার কথা যে চিঠিতে লিখেছেন তার সমর্থনে উড্‌ফার্ড ও ডিগবির সঙ্গে পরিচয় ও তাঁদের অধীনে কাজ করার নানা তথ্য থেকেই পাওয়া যায়। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারে তিনি যে বিতর্কে নেমেছিলেন সে প্রমাণ তাঁর পুস্তিকাগুলি থেকেই মেলে।

এবং, এ ব্যাপারে তিনি যে আত্মীয়দেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন তার প্রমাণ, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মা ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর মামলা-মোকদ্দমার বিবরণ। কিন্তু পিতা বেঁচে থাকতে তিনি যে পৌত্তলিকতা নিয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে পিতার বিরাগভাজন হন এবং তা সত্ত্বেও পিতা তাঁকে অর্থসাহায্য করতেন—এই সংবাদ চিঠিতে থাকলেও রামমোহনের জীবনসংক্রান্ত এ পর্যন্ত পাওয়া অন্যান্য তথ্য থেকে খুব স্পষ্টভাবে সমর্থিত হয় না। এটুকু জানা যায়, সম্পত্তি ভাগাভাগির পরেও রামমোহন পিতার কাছে বর্ধমানে যেতেন এবং পিতার বিষয় সম্পত্তিও দেখা শোনা করতেন। কিন্তু 'অ্যান অ্যাপিল টু দি ক্রীশ্চান পাবলিক' বই-এর ভূমিকায় পিতামাতার এই বিরাগভাজনের একটু ইঙ্গিত বোধহয় আছে: 'a renunciation [পৌত্তলিকতা-বিরোধিতা] that, I am sorry to say brought severe difficulities upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his countrymen for several years.' কাজেই মনে হয়, পিতা বেঁচে থাকতে তিনি লিখিত আকারে পৌত্তলিকতা-বিরোধিতা না করলেও পৌত্তলিকতা-বিরোধী মত প্রকাশ করতেন বলে বাবা-মার বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

চিঠিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে। 'আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এখানে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণ বিষয় ছিল।

রামমোহনের মা পৌত্তলিকতা-বিরোধী রামমোহনকে বিধর্মী বলে আইনানুসারে তাঁকে সম্পত্তিচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন যেমন নিজেকে বিধর্মী বলতে চান নি, তাঁর প্রতিপক্ষও তাঁকে বিধর্মী বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। কাজেই চিঠিতে তিনি যে হিন্দু-ধর্মকে আক্রমণ করেন নি বলে উল্লেখ রয়েছে তা অসত্য নয়। হিন্দুধর্মের গোঁড়া সমর্থকরা তাঁকে যে ধর্মবিদ্বেষী বলে আক্রমণ করেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রামমোহনের পক্ষে এই কথা বলা খুবই সম্ভব।

চিঠির শেষাংশে রামমোহন ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপ যাবার যে-সব কারণ দেখিয়েছেন তাও অন্যদের স্মৃতিকথা, নথিপত্র, জীবনী, চিঠিপত্র ও অন্যান্য তথ্য থেকে সমর্থিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদের বিচার, সতীদাহ সম্পর্কে প্রীভি কাউন্সিলের আপিল এবং দিল্লির সম্রাটের দৌত্য—প্রধানত এই তিনটি উদ্দেশ্যই রামমোহনের ইংল্যাণ্ড যাবার প্রত্যক্ষ কারণ। চিঠিতে উল্লিখিত এই কারণগুলি অন্যান্য তথ্যের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। কাজেই কেউ স্বীকার করুন নাই করুন, চিঠিটি যে আত্মপরিচয়মূলক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং মনে হয় ম্যাক্স্মূলর এই চিঠির গুরুত্বকে সঙ্গত কারণেই অস্বীকার করতে চান নি। কাজেই আত্মচরিতের শিল্প-গুণ যে আত্ম-পর্যবেক্ষণমূলক স্বরচিত জীবনকাহিনীর ওপর নির্ভর করে, সেই বিস্তৃত আত্ম-নিরীক্ষা এ চিঠিতে না থাকতে পারে, কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সূত্রটুকু চিঠিতে আছে। এই যুক্তিতেই প্রথম আধুনিক ভারতীয়ের এই সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়টুকু বাঙালী মনীষী ও চিন্তানায়ক, ধর্মসংস্কারক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য জীবনশিল্পী লেখক-লেখিকাদের আত্মকথা-রচনার প্রাথমিক চেষ্টা।

"MY Dear FRIEND,

"In conformity with the wish you have frequently expressed, that I should give you an outline of my life, I have now pleasure to give you the following very brief sketch.

"My ancestors were Brahmins of a high order, and, from time immemorial, were devoted to the religious duties of their race, down to my fifth progenitor, who about one hundred and forty years ago gave up spiritual exercises for wordly pursuits and aggrandisement. His descendants ever since have followed his example, and, according to the usual fate of courtiers, with various success, sometimes rising to honour and sometimes falling; sometimes rich and sometimes poor; sometimes excelling in success, sometimes miserable through disappointment. But my maternal ancestors, being of the sacerdotal order by profession as well as by birth, and of a family than which none holds a higher rank in that profession, have up to the present day uniformly adhered to a life of religious observance and devotion, preferring peace and tranquillity of mind to the excitements of ambition, and all the allurements of worldly grandeur.

"In conformity with the usage of my paternal race, and the wish of my father, I studied the Persian and Arabic languages,—these being indispensable to those who attached themselves to the courts of the Mahommedan princes; and agreeably to the usage of my maternal relations, I devoted myself to the study of the Sanscrit and the theological works written in it, which contain the body of Hindoo literature, law and religion.

"When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos. This, together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, but some beyond, the bounds of Hindostan, with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India. When I had reached the age of twenty, my father recalled me and restored me to his favour; after which I first saw and began to associate with Europeans, and soon after made myself tolerably acquainted with their laws and form of government. Finding them generally more intelligent, more steady and moderate in their conduct, I gave up my prejudice against them, and became inclined in their favour, feeling persuaded that their rule, though a foreign yoke, would lead more speedily and surely to the amelioration of the native inhabitants; and I enjoyed the confidence of several of them even in their public capacity. My continued controversies with the Brahmins on the subject of their idolatry and superstition, and my interference with their custom of burning widows, and other pernicious practices, revived and increased their animosity against me; and through their influence with my family, my father was again obliged to withdraw his countenance openly, though his limited pecuniary support was still continued to me.

"After my father's death I opposed the advocates of idolatry with still greater boldness. Availing myself of the art of printing, now established in

India, I published various works and pamphlets against their errors, in the native and foreign languages. This raised such a feeling against me, that I was at last deserted by every person except two or three Scotch friends, to whom. and the nation to which they belong, I always feel grateful.

"The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the praetce of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey. Notwithstanding the violence of the opposition and resistance to my opinions, several highly respectable persons, both among my own relations and others, began to adopt the same sentiments.

"I now felt a strong wish to visit Europe, and obtain, by personal observation, a more thorough knowledge into its manners, customs, religion, and political institution. I refrained, however, from carrying this intention into effect until the friends who coincided with my sentiments should be increased in number and strength. My expectations having been at length realised, in November, 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India company's charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India, and its future government, would be determined for many years to come, and an appeal to the King in Council, against the abolition of the practice of burning widows, was to be heard before the Privy Council and his Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before the

authorities in England certain encroachments on his rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April, 1831.

"I hope you will excuse the brevity of this sketch, as I have no leisure at present to enter into particulars; and

"I remain, &. c.,
RAMMOHUN ROY"

[রামমোহন কাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। তাঁর অন্যতম জীবনীকার মেরী কার্পেণ্টারের পিতা ডঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার মনে করেন এটি তাঁর কলিকাতাস্থিত বন্ধু গর্ডনকে লিখিত (Mary Carpenter : The Last Days in England of the Raja Rammohun Ray—2nd ed., p. 17)। প্রখ্যাত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাত্মা 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'-এ এই ইংরিজি রচনার বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১২৮৭ সালের ১১ই মাঘে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে (পৃঃ ৪-৮) অনুবাদটি পাওয়া যাবে।]